- ইংরেজদের প্রেতাত্মারা আবার সক্রিয়
- প্রয়োজন একজন শাহ আ: আজীজের
- ড্রোন হামলা এবং বিশ্বজুড়ে মার্কিন গুপ্তহত্যা
- কাশ্মীরী মুজাহিদদের বিজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র

যোগাযোগের ঠিকানা
মারকাজুল উলুম আল-ইসলামিয়া
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৭০-২০২৩৫৭, ০১৯১২-৩৯৫১২৫
০১৬৮৩-৮১০৫৫৩
ইমেইল : attibyean@gmail.com
ওয়েব : www.attibyean.tk

মূল্য : ২০ টাকা (নির্ধারিত)

সূচিপত্র

যারা আল্লাহকে অথবা আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে অথবা কটূক্তি ও গালাগালি করে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদ- । আল্লাহর জমিনে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকে না । তাদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই । এ ব্যাপারে ইসলামের সকল মাযহাব ও দল-মত নির্বিশেষে সকলেরই ইজমা রয়েছে । কিন্তু এদেশের মুসলিম জাতি তাদের পাওনা শাস্তি না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিল-মিটিং করেই ক্ষ্যান্ত হচ্ছেন । আর তাতে নাস্তিক-মুরতাদরাই সুবিধা পাচ্ছে । সরকার তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে । সাধারণ নাস্তিক-মুরতাদরা তাদের নেতা খুঁজে পাচ্ছে । আর দেশি-বিদেশি প্রভুরা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে । অথচ সাহাবায়ে কিরামগণ এ ধরনের কোনো বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিল-মিটিংয়ের দিকে না গিয়ে সরাসরি তাদের যথাযথ পাওনা চুকিয়ে দিয়েছেন ।

যারা আল্লাহকে অথবা আল্লাহর রাসুল (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে অথবা কটূক্তি ও গালাগালি করে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড । আল্লাহর জমিনে তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার থাকে না । তাদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই । এ ব্যাপারে ইসলামের সকল মাযহাব ও দল-মত নির্বিশেষে সকলেরই ইজমা রয়েছে । কিন্তু এদেশের মুসলিম জাতি তাদের পাওনা শাস্তি না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিল-মিটিং করেই ক্ষ্যান্ত হচ্ছেন । আর তাতে নাস্তিক-মুরতাদরাই সুবিধা পাচ্ছে । সরকার তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে । সাধারণ নাস্তিক-মুরতাদরা তাদের নেতা খুঁজে পাচ্ছে । আর দেশি-বিদেশি প্রভুরা তাদের সাহায্য-সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে । অথচ সাহাবায়ে কিরামগণ এ ধরণের কোনো বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিল-মিটিংয়ের দিকে না গিয়ে সরাসরি তাদের যথাযথ পাওনা চুকিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু বর্তমানে যখনই এরকম কোনো বিষয় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখনই একদল লোক মিছিল-মিটিং ও বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়া শুরু করে দেয় এবং তাদেরকে হিরো বানায় । সরকার তাদের নিরাপত্তা দেয় । বিদেশিরা তাদের আশ্রয় দেয় । দাউদ হায়দার, তাসলিমা নাসরিন, সালমান রুশদীরা এর জ্বলন্ত প্রমাণ । তবে এদের পাওনা চুকিয়ে দেওয়ার পরে অন্যদের সাবধান করার জন্য এধরণের কর্মসূচী পালন করা যেতে পারে । কিন্ত তা না করে শুধু মিছিল-মিটিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং কেউ যদি এদের যথাযথ পাওনা চুকিয়ে দেয় তাহলে তাদেরকে জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়ীত করা । তাদের বিরূদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে শুরু করে দেয়া । তাদের পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়া উচিত নয় । বরং তাদের আশ্রয় দেয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা ঈমানী দায়িত্ব ।

কুরআন একটি মু'জিযা

শায়খুল হাদীস মুফতী
মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ('নিশ্চয়, আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না।' সুরা নিসা, ৪ঃ১০৫)। এ আয়াতে আল্লাহ (সুবঃ) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন তাবিজ লিখার জন্য বা মেশ্‌ক-জাফরান দিয়ে লিখে ধুয়ে খাওয়ার জন্য বা কেউ মারা গেলে পার্থিব সামান্য স্বার্থে খতম পড়ানোর জন্য নয়। বরং এটি নাযিল করা হয়েছে মানব জাতির মধ্যে বিচার ফায়সালা করার জন্য। সুতরাং যেসকল বিষয়ে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বিধান রয়েছে সেসকল বিষয়ে কোনো মানুষের আইন রচনা করা বা মানব রচিত আইনে বিচার ফায়সালা করার অধিকার নেই। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ('আর আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলকে অমান্য করলো সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।' সুরা আহযাব, ৩৩ঃ৩৬)।

আমাদের সমাজে অনেক মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদেরকে মুমিন দাবী করে, আবার তাদের অনেকে হয়তো সালাত, সিয়াম, হজ্জ্ব, যাকাত সহ বিভিন্ন ইবাদতও করে। কিন্তু আল্লাহর আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করা পছন্দ করে না। এ জাতীয় ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে যতই দ্বীনদার, মুমিন, মুসলিম দাবী করুক না কেনো আল্লাহর কাছে তারা মোটেই মুমিন হিসাবে বিবেচিত নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেছেনঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (' আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়।' সুরা বাকারা, ২ঃ৮)। এ আয়াতে বলা হয়েছে তারা মুমিন নয়। কিন্তু কেনো মুমিন নয় তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। কিন্তু পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ (সুবঃ) বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

('অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। সুরা নিসাঃ ৪ঃ৬৫')। এ আয়াতে বিশেষভাবে বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে তাকে মুমিন বলা হয়নি। শুধু মেনে নেওয়াই নয়, বরং যদি মনের ভিতরে কোনো প্রকার দ্বিধা-দন্দ্ব ও সংশয় থাকে তাহলেও আল্লাহর কাছে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। এ কারণেই যারা মানবরচিত আইনে বিচার-ফায়সালা করে তাদেরকে ত্বা-গুত বলেছেন এবং যারা তাদের কাছে বিচার নিয়ে যায় তাদের চরমভাবে তিরস্কার করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ

يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

('তুমি কি তাদের দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা ত্বা-গুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।' সুরা নিসা, ৪ঃ৬০)।

এ আয়াতে ত্বা-গুতের আদালতে বিচার প্রার্থীদের ঈমানের দাবীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আর যারা মানব রচিত আইনে বিচার-ফায়সালা করে তাদেরকে ত্বা-গুত বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে এ ধরনের বিচারকদের কাফির-ফাসিক ও জালিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ('আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির' সুরা মায়েদা, ৫ঃ৪৪)। এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে কাফির বলা হয়েছে। অপর আয়াতে জালিম বলা হয়েছেঃ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ('আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই জালিম।' সুরা মায়েদা, ৫ঃ৪৫)। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে ফাসিক বলা হয়েছেঃ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ('আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক।' সুরা মায়েদা, ৫ঃ৪৭)। কেউ হয়তো বলতে পারে যে, এরা যদিও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন করে না, কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে তো তারা অস্বীকার করে না। বরং অনেকে যথেষ্ট আমল করে। এদের ব্যাপারে কুরআনের ফায়সালা কি? এদের ব্যাপারে কুরআনের নিম্নের আয়াতটি শুনিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

('তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আলাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।' সুরা বাকারা, ২ঃ৮৫)।

এ জাতিয় লোকেরা নিজেদের মধ্যমপন্থী বলে দাবী করে। অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান মানে, আর কিছু ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধান মানে। এরা ইসলাম ও কুফরের মাঝে তৃতীয় একটি রাস্তা তৈরি করতে চায়। আল্লাহ (সুবঃ) এ প্রকার লোকদের সম্পর্কে বলেনঃ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (১৫০) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

('নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তার রাসুলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব।' সুরা নিসা, ৪ঃ১৫০,১৫১)।

সুতরাং যারা ধর্মীয় জীবনে মুসলিম দাবী করে আর রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম নিরপেক্ষ বলে দাবী করে অথবা ধর্মকে মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে মানুষের তৈরি করা মনগড়া আইন-বিধান দিয়ে পরিচালনা করার মাধ্যমে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার পক্ষে তাদের প্রকৃত অবস্থা এ আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তারাই প্রকৃত কাফির।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

নিয়মাবলী

এজেন্টদের জন্য

- বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত হতে আপনি 'আত্ তিবইয়ানের' এজেন্ট হতে পারেন।
- সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্ট দেয়া হয়।
- প্রতি বিশ কপিতে ২টি করে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
- অর্ডার পেলে পত্রিকা ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- ডাক খরচ কর্তৃপক্ষ বহন করবে।
- কোনো জামানত পাঠাতে হয় না।
- এজেন্সিকে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।
- ৫০ কপির উপরে এজেন্সির কমিশন বাড়ানো হয়।
- এজেন্ট হতে হলে আপনার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা 'আত্ তিবইয়ানের' অফিস বরাবর পাঠাতে হবে।

গ্রাহকদের জন্য

- বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত হতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- সর্বনিম্ন ছয় মাসের জন্য গ্রাহক করা হয়।
- বছরের যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
- ছয় মাস বা এক বছরের গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পাঠাতে হয়।

(পূর্ব প্রকাশের পর)

হাদিসের অবস্থান

কাজী ইয়াজ বলেন, মুহাদ্দীসিনদের কেউ কেউ এ হাদিসটিকে 'সুলুসুল ইসলাম' (ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ, তিনটি হাদিস ইসলামের যাবতীয় বিধানকে শামিল করে। তার মধ্যে একটি হলো আলোচ্য হাদিস « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّات (সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল)। দ্বিতীয়টি হলো مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه (কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম পরিচয় হলো অযথা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা) (তিরমিযি ২৩১৮, মুসনাদে আহমাদ ১৭৩৭, মেশকাত ৪৮৩৯)। আর তৃতীয়টি হলো الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا تَشَابَهَ كَانَ أَبْرَأَ لدينه وَعِرْضه، (হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহযুক্ত অনেক বিষয়। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত জিনিস বর্জন করলো, সে ব্যক্তি তার দ্বীন এবং সম্মান সবচেয়ে বেশি হেফাজত করলো) (বুখারী ৫২, মুসলিম ৪১৮১, তিরমিযি ১২০৫, নাসায়ী ৫৪১২, ইবনে মাজাহ ৩৯৮৪)। এই তিনটি হাদিসের মাধ্যমে তিনটি মৌলিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমটি নিয়্যাত বিষয়ক, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত আমল, কথা ও কাজ বিষয়ক, তৃতীয়টি মু'আমালাত, মু'আশারাত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক। এই তিনটি জিনিস ঠিক করতে পারলে সবকিছুই ঠিক হয়ে যায়। এ কারণে আলোচ্য হাদিসটিকে ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবার কেউ আলোচ্য হাদিসটিকে 'রুবুউল ইসলাম' (ইসলামের এক-চতুর্থাংশ) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা উপরোক্ত তিনটির সাথে আরেকটি হাদিস যোগ করেছেন। অবশ্য চতুর্থ হাদিসটি কোনটি সে ব্যাপারে হাদিস বিশারদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন সেটি হলো:

ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো যার ব্যাপারে আমাদের কোনো নির্দেশ নেই, সেটি প্রত্যাখ্যাত।) (বুখারী ২১৪১)

কেননা উপরের তিনটির সাথে যদি রাসূলের সুন্নাহ না থাকে তাহলে কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। এ হাদিসে বিদ'আতকে বর্জন করে সুন্নাহকে গ্রহণ করার নির্দেশ করা হয়েছে। সে কারণে এ হাদিসটিও ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর একটি।

আবার কেউ বলেছেন সেটি হলো: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে তা অন্য ভাইয়ের জন্য ভাল না বাসবে।) (বুখারী ১৩, তিরমিযি ২৫১৫, নাসায়ী ৫০৩১, ৫০৩২, মুসনাদে আহমাদ ১৩৯৬৩)

আবার কেউ কেউ বলেছেন সেটি হলো: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس (তুমি দুনিয়া থেকে বিমুখ হও আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী হও মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।) (ইবনে মাজাহ ৪১০২, মেশকাত ৫১৮৭)

মোট কথা, আলোচ্য হাদিসটি দ্বীন ইসলামের একটি মূলনীতি এবং আমলের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত এবং পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } [البينة : ٥] 'আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে,' (সূরা বায়্যিনাহ, ৯৮:৫)

বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নের কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে।

إكمال المعلم شـــرح صـــحيح مـــسلم – للقاضي عياض – (৬ / ১৬৯)

المنتقى – شرح الموطأ – (8 / ২৮৭)

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمــذي – (৯ / ২৫৮)

যুগে যুগে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য নানান ধরণের চক্রান্ত করা হয়েছে। কিন্তু যখনই কেউ ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে তখনই ইসলাম স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে দাড়িয়েছে। মুহাম্মদ (সা.) কে যখন হত্যা করার চক্রান্ত করা হলো তখন তিনি হিজরত করে ইসলামের বিজয়ের সূচনা করলেন। বদর যুদ্ধে আবু জাহেলরা যখন মুসলিমদের নির্মূল করার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে এলো ইসলাম তাদের নির্মূল করে বিজয়ী বেশে স্বগৌরবে মদিনায় প্রত্যাবর্তণ করলো। আহযাব নামক বহুজাতিক বাহিনী যখন মদিনায় করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও ইসলাম তার বিজয়ের গতি বৃদ্ধি করেই চলেছে। কামাল আতাতুর্ক নামক ইসলামের ইতিহাসের জঘন্যতম ব্যক্তি ১৯২৪ সালে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ইসলামি খেলাফত ব্যবস্থার কফিনের উপর শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়। তখন
মনে করা হয়েছিলো, ইসলামের সূর্য বুঝি তুর্কি খেলাফতের অবসানের মাধ্যমে চিরতরে ডুবে যাবে। কিন্তু না তা হয়নি! সর্বশেষ ভারতবর্ষ যখন ইংরেজরা দখল করে নেয় তখনও তারা ইসলামকে ধ্বংস করার নানান চক্রান্ত সুপারিশ নামা গুলো বাস্তাবায়ণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। লক্ষ লক্ষ কুরআন মাজীদকে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। মাদরাসা-মসজিদগুলো ধ্বংস করা হয়। বড় বড় মসজিদ গুলোকে ঘোড়ার আস্তাবল বানানো হয়। মসজিদ মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করে হিন্দুদের জমিদারী প্রদান করা হয়। আলেম ওলামাদের চরম নির্যাতন করা হয়। কাউকে হত্যা করা হয়। কাউকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ঐতিহাসিক ড. টামসান লিখেন, দিল্লির চাঁদনী চক থেকে খায়বার পর্যন্ত এমন কোনো বৃক্ষ

ইংরেজদের প্রেতাত্মারা আবার সক্রিয়
প্রয়োজন একজন শাহ আ: আজীজের

শায়খুল হাদিস মুফতি
মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

আক্রমন করার জন্য খন্দকের কিণারা পর্যন্ত এসে উপণীত হলো তখন তারা আসমানী গযবে লন্ডভন্ড হয়ে ব্যর্থ মুখে ফিরে গেলো। অপর দিকে মুসলিম জাতি স্বগৌরবে মদিনায় ফিরে গেল এবং আল্লাহর নির্দেশে জিবরাঈলের পরামর্শে গাদ্দার বনু কুরাইযাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ইয়াহুদী চক্রান্তের চির সমাপ্তি ঘটান। মক্কার কাফেরগণ হুদাইবিয়া সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমদের মিত্রদের বিরূদ্ধে সামরিক সাহায্য করলো পরিণতিতে মক্কা অভিযানের মাধ্যমে 'ফাতহে মুবীন' অর্জণ হলো।
ত্যাগ ও কুরবানী বিহীন ইসলামের বিজয় কল্পনা করা যায় না। যুগে যুগে যারাই ইসলামের জন্য কাজ করেছেন তাদেরকেই কঠিন পরিক্ষার সম্মুক্ষীন হতে হয়েছে। চার খলিফার তিনজনকেই শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের মধ্য থেকে উল্লেখ যোগ্য চার ইমামদের কাউকে হত্যা করা হয়েছে কাউকে চরম নির্যানত করা হয়েছে কাউকে শাসকদের জুলুমের স্টীমরোলার সহ্য করে। ড. উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে বিশেষ টীম গঠন করে ভারত বর্ষে ইংরেজ বিরোধী শক্তির উৎস অনুসন্ধান করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তারা দীর্ঘ এক বছর পর্যন্ত তদন্ত করে রিপোর্ট দিলো যে, 'ভারত বর্ষে ইংরেজদের জন্য একমাত্র শত্রু হলো মুসলিম জাতি। তার প্রথম কারণ : আমরা তাদের থেকেই রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছি। তারা তা পুনরূদ্ধার করার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় কারণ হলো : মুসলিম জাতি বিশ্বাস করে আল্লাহর বিধান ছাড়া কোনো মানব রচিত সংবিধানের কাছে মাথা নত করা যাবে না।' এরপর তারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য তিনটি পরামর্শ দেয়। এক. মুসলিম জাতির ঈমানী শক্তির প্রধান উৎস পবিত্র কুরআনকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করতে হবে। দুই. কুরআন প্রচারের কেন্দ্র স্থল মাদরাসা-মসজিদগুলো গুড়িয়ে দিতে হবে। তিন. কুরআনের ধারক-বাহক ও প্রচারক আলেম সমাজকে নির্মূল করতে হবে। ড. টামসান লিখেন, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর ইংরেজ সরকার উপরোক্ত ছিলনা যার প্রতিটি ডালে ডালে এককে জন আলেমকে ফাঁসিতে ঝুঁলানো না হয়েছে। ওলামায়ে কিরামদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। তাদের জীবন্ত অবস্থায় শুকরের চামড়ার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ার পাঁয়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে দৌঁড়ানো হয়েছে। তাদের অনেককে কঠিন নির্যাতন করে আন্দামান অথবা মাল্টা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামকে ধ্বংস করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। শাহ আব্দুল আজীজ (র.) ভারতকে 'দারুল হারব' ঘোষণা করে সর্বাত্মক জিহাদের ডাক দিলে গোটা ভারত বর্ষে দাবানলের মতো ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। ইংরেজরা দিশেহারা হয়ে তাদের এদেশীয় দালালদের ডেকে পরামর্শ করলো। তারা বললো, তোমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কুরআন পুড়িয়ে ফেললাম, মাদরাস-মসজিদ বন্ধ করে দিলাম, আলেমদের হত্যা করলাম তারপরেও কেন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে? তখন ইংরেজদের এদেশীয় দালালরা পরামর্শ

দিলো, এভাবে জুলুম নির্যাতন করে ইসলামকে ধ্বংস করা সম্ভব নয় । তোমরা যে কুরআন পুড়িয়েছ সেগুলো কাগজের কুরআন । তোমরা যে মাদরাসা-মসজিদ ধ্বংস করেছো সেগুলো ইটের ও কাঠের মাদরাসা-মসজিদ । কিন্তু মুসলিম জাতির বুকের ভিতরে যে কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে তা কি করে ধ্বংস করবে? এজন্য তারা পরামর্শ দিলো ইসলামকে যদি সত্যিকার অর্থেই ধ্বংস করতে হয় তাহলে তাদের মধ্যে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী একদল আলেম তৈরী করতে হবে । যারা ইংরেজ সরকারকে এদেশের জন্য আল্লাহর রহমত বলে প্রচার করবে । যারা মুসলিম যুবকদের ইংরেজ শাসকদের আনুগত্য প্রদান করার জন্য ফতওয়া প্রদান করবে । জিহাদকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বলে আখ্যায়িত করে মুসলিম যুবকদের এর থেকে নিরূৎসাহিত করবে । মাদরাসা ধ্বংস করার পরিবর্তে এমন সিলেবাস তৈরী করতে হবে যার মধ্যে শুধু নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, অজু, গোসল ইত্যাদির আলোচনা থাকবে । ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার সবক থাকবে । ইসলামের পরিভাষাগুলোকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করবে । যেমন: ইসলাম অর্থ আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে শান্তির শিক্ষা দিবে । জিহাদ অর্থ ইসলামের বিরোধী শক্তির বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার পরিবর্তে আত্মার জিহাদ বা নফসের জিহাদের শিক্ষা দিবে ।

ইংরেজ সরকার নতুন এই পরামর্শকে স্বাগত জানালো । সেজন্য গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত আলেমদের তারা খুজে বের করলো । যে ব্যক্তি ইংরেজের বিরূদ্ধে জিহাদ করাকে হারাম বলে ফতওয়া দিলো । এ প্রসঙ্গে তার একটি প্রসিদ্ধ কবিতা ছিলো এই,

ইংরেজদের পক্ষে অসংখ্য বই পুস্তক রচনা করলো । ইংরেজ সরকারকে 'জিল্লুল্লাহি ফিল আরদ' আল্লাহর ছায়া হিসাবে অভিহিত করলো । এরপর তারা কলকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল পদের জন্য কিছু শর্তারোপ করলো যা কোনো মুসলিম শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না । বাধ্য হয়ে একজন খৃস্টানকে ঐ পদে নিয়োগ দেওয়া হয় । এবং ইংরেজ সরকারের মর্জি মতো সিলেবাস তৈরী করার জন্য বিশিষ্ট খৃস্টান পাদ্রী ড. ম্যাকলিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় । তিনি ইংরেজ সরকারের মর্জি মাফিক মাদরাসার সিলেবাস তৈরী করেন । যার প্রভাব আজো ভারত বর্ষের মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান ।

বিশ্ব মুসলিমদের ধ্বংসের জন্য নব্য ইংরেজদের পরামর্শ :

ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ইয়াহুদী-খৃস্টান ও তাদের অনুসারী নাস্তিক-মুরতাদরা সবসময় চেষ্টা করেছে । ফ্রি-ম্যাসন, রোটারী ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব ও বিভিন্ন এন.জি.ও তৈরী করার পরে বর্তমানে আমেরিকার ইয়াহুদীরা আরেকটি সংগঠন তৈরী করেছে যার নাম হলো RAND এদের ষোলশত অভিজ্ঞ কর্মী রয়েছে । যাদের মূল কাজ হলো, ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করে ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন কলা-কৌশল তৈরী করে আমেরিকার সরকারকে তা বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা । তাদের এরকমই কিছু পরামর্শ এখানে তুলে ধরা হলো:

RAND এর পরামর্শ ।

"র‍্যান্ড (RAND) ইনস্টিটিউটের ২০০৭ সালের একটি রিপোর্ট – এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, "অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বে যে সংগ্রাম চলছে, তা সত্যিকার অর্থে একটি 'মতাদর্শগত যুদ্ধ' এর ফলাফলই নির্ধারণ করবে

কিন্তু তাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে অনুরোধ করবো। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যখনই কোনো বাতিল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই তাদের মোকাবেলায় হকের পতাকা নিয়েও একদল মানুষ তাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে। বাতিল যখন কাবিলের রূপ ধারণ করে মাঠে নেমেছে হক তখন হাবিলের রূপ ধারণ মোকাবেলা করেছে। বাতিল যখন নমরুদের রূপ ধারণ করে মাঠে নেমেছে হক তখন ইবরাহিম (আ.) এর রূপ ধারণ করে মোকাবেলা করেছে। বাতিল যখন ফেরাউনের রূপ ধারণ করে মাঠে নেমেছে হক তখন মূসার (আ.) রূপ ধারণ করে তার মোকাবেলা করছে। বাতিল যখন আবু জাহেল, আবু লাহাবের রূপ ধরে মাঠে নেমেছে হক তখন মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সা.) এর রূপ ধরে মোকাবেলা করেছে। বাতিল যখন মুসলিম খলিফাদের মুখোশ পরে আত্মপ্রকাশ করেছে হক তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) এর রূপ ধরে মোকাবেলা করেছে। বাতিল যখন ভারত বর্ষে ইংরেজদের রূপ ধরে মাঠে নেমেছে হক তখন শাহ আবদুল আজীজ দেহলভীর (রহ.) রূপ ধরে মোকাবেলা করেছে। বাতিল যখন নাস্তিক-মুরতাদ বুদ্ধিজীবি, কবি-সাহিত্যিক ও ব্লগারদের রূপ ধরে মাঠে নেমেছে হক তখন হেফাজতে ইসলামের ব্যানার নিয়ে মাঠে নেমেছে।

মুসলিম বিশ্বের আগামী দিনের পথ নির্দেশনা।"
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চতুর্মাসিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, "যুক্তরাষ্ট্র এমন এক যুদ্ধে জড়িত যা একই সাথে অস্ত্রের ও আদর্শের। এই যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় শুধুমাত্র তখনই অর্জিত হবে যখন চরমপন্থীদের আদর্শকে তাদের নিজেদের সমাজের জনগণ এবং সমর্থকদের চোখে কলঙ্কিত অথবা অখ্যাত করা যাবে।"
সুতরাং তাদের বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যে যুদ্ধ ও সংঘাত চলছে তা কোন সাধারণ বিষয় নয়। বরং তা হচ্ছে মতাদর্শের যুদ্ধ। মুসলিম দেশগুলোতে সঠিক ইসলাম থাকবে নাকি অমুসলিমদের মর্জি মোতাবেক তথাকথিত মডারেট ইসলাম থাকবে? পূর্ণাঙ্গ ইসলাম থাকবে নাকি পীরপন্থী ও সূফীবাদীদের নরম ইসলাম থাকবে? সত্যিইতো আজ মুসলিম বিশ্ব মাতদর্শগত যুদ্ধে লিপ্ত আছে। ফিলিস্তিন, কাশ্মির, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ সকল মুসলিম বিশ্বে একদিকে একদল মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করছে অপরদিকে আরেকদল নামধারী মুসলিম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছে। এই যে আদর্শের দ্বন্দ্ব চলছে, এই ব্যাপারে অমুসলিমরা কি ভাবছে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা একটি ইউ.এস.নিউজ (US news) এবং ওয়াল্ড রিপোর্ট তুলে ধরছি। সেখানে বলা হয়েছে:
"৯/১১ আক্রমনের পরে বারবার ভুল পদক্ষেপ নেয়ার পর আজ ওয়াশিংটন পাল্টা আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের তুলনায় নজিরবিহীন এক রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণা শুরু করেছে যুক্তরাষ্টের সরকার। সামরিক, মনস্তাত্ত্বিক অভিযান এবং সি.আই.এ (CIA) এর গোপন অভিযান পরিচালনার জন্যে নিয়োজিত দলগুলো থেকে শুরু করে প্রকাশ্যে যোগাযোগ মাধ্যম (রেডিও, টি.ভি, সংবাদপত্র, ইত্যাদি) এবং বুদ্ধিজীবিদের অর্থনৈতিক যোগান দেওয়া পর্যন্ত। ওয়াশিংটন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে এমন এক প্রচার অভিযানে, যার লক্ষ্য শুধুমাত্র মুসলিম সমাজকেই নয়, ইসলামকেও প্রভাবিত করা।"
বুঝা গেল কাফের শক্তিগুলো শুধু মুসলিমদেরকেই ধ্বংস করতে চায় না বরং ইসলামকেও বিকৃত করার মাধ্যমে পরিবর্তণ করতে চায়। আর এই কাজটি তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তারা পারে বোমা হামলা করে কিছু মুসলিমদেরকে হত্যা করতে কিন্তু ইসলামের কোন পরিভাষাকে পরিবর্তণ করা অথবা অর্থ বিকৃতি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটার জন্য প্রয়োজন একদল আলেম, পীর-মাশায়েখ, বড় বড় মসজিদের ইমাম ও খতীব, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা যারা ইসলামের অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে বলবে ইসলাম মানে শান্তি। যারা জিহাদের অর্থ পরিবর্তণ করে বলবে জিহাদ মানে চেষ্টা অথবা তারা বলবে নফসের জিহাদ বড় জিহাদ। অথবা বলবে এই যুগে অস্ত্রের জিহাদ নয় বরং কথার জিহাদ, কলমের জিহাদ ও নফসের জিহাদের মাধ্যমেই দ্বীন কায়েম করতে হবে। এ জন্য ইতিমধ্যেই ইয়াহুদী-খৃষ্টান জগত অনেক বড় বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে যা তাদের মুখেই শুনা যাক। ঐ প্রবন্ধেই বলা হয়েছে:
"ওয়াশিংটন গোপন ভাবে কমপক্ষে চব্বিশটি দেশে অনুদান প্রদান করেছে রেডিও এবং টেলিভিশনে (জিহাদ বিমুখ) ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য, মুসলিম স্কুলে (জিহাদ বিরোধি) কোর্স চালুর জন্যে। অনুদান প্রদান করেছে মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের জন্যে ও রাজনৈতিক কর্মশালার জন্যে অথবা অন্যান্য কর্মসূচি পালনের জন্যে। শুধুমাত্র 'মডারেট (সংযত, মধ্যপন্থী, নরমপন্থী।) ইসলামকে' উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য দেয়া হচ্ছে মসজিদ নির্মাণের জন্যে, এশিয়ান কুর'আন রক্ষা করার জন্যে, এমন কি ইসলামী স্কুল (মাদরাসা) প্রতিষ্ঠা করার জন্যে।"
বুঝা গেল অমুসলিমরা ওদের দালাল তৈরী করার জন্য কতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং তারা এ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই অনেক সফলতাও অর্জণ করেছে। বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষনের সমাপনী অনুষ্ঠানে আমেরিকার নর্তকী দিয়ে ব্যালেড্যান্স করানোর মাধ্যমে তার প্রমান পাওয়া যায়।
Rand থেকে প্রকাশিত, শেরিল বার্নার্ড রচিত একটি প্রতিবেদনের নাম হলো "সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম" (সামাজিক গণতান্ত্রিক ইসলাম)। শেরিল বার্নার্ড একজন ইহুদী, যে বিয়ে করেছে একজন মুরতাদকে, যখন সে নামধারী মুসলমান ছিল তখন তার নাম ছিল জালমাই খলিল জাদ। জালমাই খলিল জাদ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সে এক সময় জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছে এবং সে আফগানিস্তান ও ইরাকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল। তাকে খুব স্পর্শকাতর পদে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। শেরিল বার্নার্ড হচ্ছে তার স্ত্রী। সে (শেরিল বার্নার্ড) র‍্যান্ড-এর জন্যে "সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম" নামক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। সে প্রতিবেদনে ইসলামের যারা সঠিক কথা বলে, তাওহীদের কথা বলে, শিরক-বিদআতের বিরূদ্ধে কথা বলে, জিহাদ ও মুজাহিদীনদের পক্ষে কথা বলে তাদের বিরূদ্ধে, তাদের ভাষায় মডারেট মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়। নিম্নে তাদের পরামর্শগুলোর তুলে ধরা হলো:
এক: "আমাদের র‍্যান্ড মুসলিমদের কাজ (লেখা বই, প্রবন্ধ) কম খরচে (বা ভর্তূকি দিয়ে) প্রকাশ এবং বিতরণ করা উচিত।" এটা হয় মিথ্যার প্রসার ঘটানোর জন্যে।
দুই: "তাদেরকে (মডারেট মুসলিম) উৎসাহ দান করা জনসাধারণ এবং যুবকদের উদ্দেশ্যে বই-পুস্তক, রচনা-প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখার জন্যে। যাতে যুবকরা এবং সাধারণ মুসলমানগণ জিহাদ ও জঙ্গিবাদের বিরূদ্ধে অবস্থান নেয়।"
তারা উপলব্ধি করেছে যে মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণ সত্যকে বুঝে নিতে সক্ষম এবং তারা জানে কারা তাদের জন্য কথা বলে এবং কারা বলে না। এই অমুসলিমরা জানে যে যুবকদের থেকেই তাদের বিপদ আসে কারণ যুবকরাই হল তারা যারা সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে পারে। ইবরাহিম (আ:) যুবক

ছিলেন যখন তিনি মুর্তিগুলোকে ধ্বংস করে ছিলেন। এবং সূরা কাহাফের গুহার ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে যারা গুহায় চলে গিয়েছিল তারা যুবক ছিল। আমরা সীরাতের গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, রাসূল (সাঃ) এর নবুওয়াতের প্রথম দিকের অনুসারীরা ছিলেন যুবক। সুতরাং সে (শেরিল বার্নার্ড) যুবকদের পথভ্রষ্ট করার জন্য উৎসাহিত করেছে।

তিন: "তাদের (মডারেট মুসলিম) দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।"

তারা এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা অনেক মুসলিম দেশের পাঠ্যক্রমকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যে সব বিষয় জিহাদ, হুদুদ, আল্লাহর শাসন নিয়ে কথা বলে তা পাঠ্যক্রম থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, সম্পূর্ণ অধ্যায়ই মুছে ফেলা হয়েছে, পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। যার ফলে স্কুল,কলেজ, ইউনিভার্সিটি এমনকি মাদরাসার ছাত্রদেরকেও জিহাদের বিরূদ্ধে অবস্থান নিয়ে ওদের শিখানো মতে জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করছে।

চার: "প্রাক-ইসলামী এবং যা ইসলামী নয় সেই সমস্ত ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রচার মাধ্যম ও পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সে সম্পর্কে সচেতনতাকে উৎসাহিত করা।"

যেমন, ফেরাউনিক সভ্যতা কে পুনর্জাগরিত করা। ফেরাউন সম্পর্কে আলোচনা করা এবং ওদের সম্পর্কে একটি ভাল মনোভাব সৃষ্টি করা। ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে ওদের সভ্যতা, ওদের সাফল্য, ওরা যে উন্নয়ন সাধন করেছিল তা নিয়ে আলোচনা করা, সমাজে ইসলামের পূর্ব সংস্কৃতিকে পুনর্জাগরিত করা এবং প্রাক-ইসলামী আরব এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে আলোচনা করা। আবার, উত্তর আফ্রিকার বর্বর লোকদের নিয়ে আলোচনা করা, শামের দেশের রোমান ও গ্রীক সময়ের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা। এই কারনেই আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্নতত্ত্ববিদরা (Archeologists) মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক-ইসলামী ইতিহাসের উপর বিশেষ ভাবে নজর দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে তারা মেসোপটেমিয়া এবং ফেরাউনের সময় মিশরের অবস্থা নিয়ে অনেক আলোচনা করছে। এভাবে মুসলিম যুবকদের অন্তর থেকে ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাস ও সভ্যতাকে ভুলিয়ে দিয়ে ইসলামের পূর্বের ইতিহাস ও সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করার গভীর চক্রান্তের নীল-নকশা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পাঁচ: "সূফীবাদের জনপ্রিয়তা" এবং এর "গ্রহণযোগ্যতা" কে উৎসাহ দান করা।" এটি একটি মারাত্মক চক্রান্ত। কারণ ওরা জানে যে, ওরা হয়তো বোমা হামলা করে কিছু মুসলিমদের হত্যা করতে পারবে কিন্তু এতে স্থায়ী কোন ফায়দা হবে না। সাধারণ মুসলিম ও যুবকদের অন্তর থেকে জিহাদি চেতনা বিলুপ্ত হবে না। বরং আরো তারা কাফের-মুশরিকদের বিরূদ্ধে জিহাদ করার জন্য ঈমানী চেতনায় ফুসে উঠবে।

পক্ষান্তরে একদল আলেম, মুফতী, মুহাদ্দেস, মুফাসসির ও মসজিদের ইমাম ও খতীব যদি জিহাদের বিরূদ্ধে বক্তব্য দেয় এবং জিহাদকে বিতর্কিত করে দেয় সেটা সাধারণ জনগণ এবং যুবকদের মধ্যে অনেক বড় ধরণের প্রভাব ফেলবে। সেকারণেই তারা পীরবাদ, সূফীবাদ ইত্যাদিকে উৎসাহিত করছে।

সুতরাং ওরা তাসাউফ (সূফীবাদ) -এর প্রসার করতে চায়। এটা এই জন্য নয় যে ওরা তাসাউফকে ভালোবাসে। ওরা একে ভালোবাসে জিহাদের বিরূদ্ধে এদের অবস্থানের কারণে এবং এদের দুর্বল বা নরম পন্থী মনোভাবের কারণে। কিন্তু ওরা কি কখনও উমর আল-মুখতার (লিবিয়ার একজন বীর মুজাহিদ যিনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও ব্রিটিশ জালেম দখলদারদের হাত থেকে নিরহ মানুষদের রক্ষা করার জন্য দুনিয়ার ভোগ বিলাসীতা ত্যাগ করে জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদ করে গেছেন।) -এর তাসাউফের (দুনিয়ার বিলাসিতা ত্যাগের) কথা, অথবা উত্তর আফ্রিকা বা সেই মহা দেশে (ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে) আন্দোলন বা সংগ্রাম হয়েছিল তা প্রচার করবে?

মৌলবাদীদের বিরোধিতা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কৌশল

অতঃপর, শেরিল বার্নার্ড তার প্রতিবেদনে "মৌলবাদীদের বিরোধিতা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কৌশল" শিরোনামে কিছু প্রস্তাব পেশ করেছে। নিম্নে তার সেই প্রস্তাবগুলোর কিছু অংশ তুলে ধরা হলো:

ক. "তাদের সাথে অবৈধ দল এবং কর্মকান্ডের সম্পর্ক প্রকাশ করা।"

একারণেই আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যারা দ্বীনে হকের পক্ষে কথা বলে তাদেরকে মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী, জে.এম.বি, আল-কায়েদা ইত্যাদি বলে মুসলিম সমাজে বিতর্কিত করা হয় এবং নানাভাবে হয়রানী করা হয়।

খ. তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের পরিণতিগুলো প্রচার করা।

এখানে সে (শেরিল বার্নার্ড) বলেছে যে, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনাগুলোকে আমাদের হিসেবে নেয়া উচিত এবং তা প্রচার করা এবং তা নিয়ে বিশাল হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দেয়া। আর যখন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের বোমাগুলো আবাসিক এলাকায় পড়ে এবং মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ সবাইকে হত্যা করে, তখন তা এড়িয়ে যাও, এ সম্বন্ধে কোন কথা বলো না, এবং এ (ঘটনাগুলো) ভুলে যাও, যদি তা বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ হয়ে যায়, তাহলে অজুহাত খুঁজে বের কর। আর যদি মুসলিমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, কোন ভুল করে অথবা যদি অনিচ্ছাকৃত কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে তাকে একটি বড় বিষয়ে পরিণত কর এবং তা প্রচার করতে থাক।

এ ক্ষেত্রেও তারা অনেক সফলতা অর্জণ করেছে। আফগানিস্তানে যদি কাফের সৈন্যরা সাধারণ জনতার উপরে হামলা করে তা নিয়ে কোন হৈ-চৈ নেই কোন রকম তোলপাড় নেই। কিন্তু যদি মুজাহিদীনদের সমান্য ভুল-ভ্রান্তিও ধরা পরে সেক্ষেত্রে তিলকে তাল বানিয়ে প্রচারের ঝড় বইয়ে দেওয়া হয়।

গ. "মৌলবাদী, চরমপন্থী ও সন্ত্রাসীদের ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যে

তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকা।"
অর্থাৎ মুসলিম মুজাহিদীনদের বীরত্বের প্রশংসা করা, বন্দী শত্রুদের সঙ্গে তাদের সদাচরণ করা ইত্যাদির কোন প্রশংসা না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এরপর সে কি বলছে জানেন? সে বলছে:
"তাদেরকে মানসিকভাবে বিশৃঙ্খল এবং কাপুরুষ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত কর, খল নায়ক হিসেবে নয়।"
কখনও কখনও আপনি আপনার শত্রুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারেন তার কিছু গুণের জন্যে। যেমন ধরুন, পশ্চিমারা সালাহ্ উদ্দিন আইয়ুবীর বিনয় ও সাহসীকতাকে লুকাতে পারেনি। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন জাতি এবং জনগোষ্ঠির মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল তথাপিও শত্রুরা অন্য পক্ষকে শ্রদ্ধা করতো এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে প্রশংসা করতো। যেমন, ওরা বলতো 'হ্যাঁ এটা সত্য যে তারা আমাদের শত্রু, কিন্তু আমাদের সত্য কথা বলতে হবে, তারা সাহসী' অথবা 'হ্যাঁ এটা সত্য যে তারা আমাদের শত্রু, কিন্তু তাদেরও একটি মূল্যবোধ রয়েছে' ইত্যাদি।
শেরিল বার্নার্ডের মতে, তাদের এই ধরনের শ্রদ্ধাবোধও দেখানো উচিত নয়, মুসলিম বীরদের কখনই খল নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। তারপর সে বিশেষ ভাবে মুসলিম বীরদেরকে মানসিক ভারসাম্যহীন ও কাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রেও তারা অনেক সফলতা অর্জণ করেছে। আমরা আশ্চর্যজনক ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমানে কিছু মুসলিমনামধারী নেতা-নেত্রী, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ব্লগার এমনকি একদল বক্তা ও খতীবদেরকে তোতা পাখির মত তাদের এই শিখানো বুলিগুলো আওড়াতে শুনা যাচ্ছে। যারা পাঞ্জাবী-পায়জামা পড়ে অত্যাধুনিক মারনাস্ত্রের সামনে দাড়িয়ে শুধু বন্দুক অথবা পাথর দিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন তাদেরকে বলা হচ্ছে কাপুরুষ। আর যারা বুলেটপ্রুফ পোষাক পরিধান করে অত্যাধুনিক মারনাস্ত্রে সজ্জিত হয়েও মুসলিম মুজাহিদীনদের ভয়ে লেজ গুটিয়ে পলায়ন করে তাদেরকে বলা হচ্ছে বীরপুরুষ। যারা বন্দীদেরকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করার পরে তাদের গায়ে পেশাব করে দেয় তাদেরকে বলা হয় বীরপুরুষ। আর যারা বন্দীদেরকে নিজেদের খাদ্যের মধ্যে সমান অংশীদার বানায় অথবা নিজেরা না খেয়ে শত্রুপক্ষের বন্দীদেরকে খেতে দেয় তাদেরকে বলা হচ্ছে মানসিক ভারসাম্যহীন, কাপুরুষ। যারা সতী-সাধবী নারীদেরকে গ্রেফতার করে জেলখানার অন্ধ কুঠরিতে পালাক্রমে, জোরপূর্বক ধর্ষণ করে তাদেরকে বলা হয় বীরপুরুষ। আর যারা বন্দী নারীদেরকে আপন মা-বোনের মতো হেফাজত করে তাদেরকে বলা হয় মানসিক ভারসাম্যহীন কাপুরুষ। এটাই হচ্ছে বর্তমান ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধসহ সকল কাফের-মুশরিকদের চরিত্র।

RAND এর পরামর্শ ও বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা :

প্রিয় পাঠক! আপনারা লক্ষ্য করেছেন, র‍্যান্ড ইন্সটিটিউট কিভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার জন্য নীল নকশা তৈরী করেছে। আমরা লক্ষ্য করছি ইতিমধ্যেই তারা তাদের পরামর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য মুসলিম দেশগুলোতে এক শ্রেণীর শাসক, আইনজীবি, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, ব্লগার, মন্ত্রি, এমপি, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-শিক্ষক, এমনকি মাদরাসার একশ্রেণীর ছাত্র-শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম ও খতিবদের তারা হাত করেছে। যার ফলে ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপণী অনুষ্ঠানে আমেরিকার বেহায়া নর্তকী এসে ব্যালে ডান্স করার পর্যন্ত ধৃষ্ঠতা প্রদর্শণের সাহস পেয়েছে।
এই নব্য ইংরেজদের পরামর্শ বাস্তবায়ন করার জন্যই বর্তমান বাংলাদেশে যা করা হচ্ছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:
ক) সংবিধান থেকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা বাদ দেয়া।
খ) বিভিন্ন জায়গা থেকে ইসলাম, মুসলিম ইত্যাদি শব্দগুলো বাদ দেয়া।
গ) আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল ও ইসলামের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় তৈরী করে দেয়া।
ঘ) ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগারদের উস্কে দেওয়া এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা।
ঙ) পাঠ্যপুস্তকে ইসলাম বিরোধী আক্বীদা ঢুকিয়ে দেওয়া।
চ) রাস্তার মোড়ে, স্কুল কলেজের সামনে এবং দর্শনীয় স্থানে বিভিন্ন অজুহাতে মূর্তি স্থাপন করা।
ছ) ফরিদউদ্দিন মাসউদ গংদের তৈরী করা থাবা বাবা, ইমরান এইচ সরকার, আসীফ মহিউদ্দীন, অমি পিয়াল রহমান ও তাদের পৃষ্ঠপোষক নাস্তিক জাফর ইকবাল, মুনতাসির মামুন ও প্রথম আলো পত্রিকা গংদের উত্থান র‍্যান্ডদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরই অংশ।

পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্র :

আমাদের দেশের নতুন পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমেও র‍্যান্ড এর পরামর্শের প্রতিফলনই ঘটেছে। নিম্নে তার সামান্য নমুনা পেশ করা হলো–

আল্লাহর সন্তান সাব্যস্তকরণ :
দাখিল বাংলা সাহিত্য, নবম-দশম শ্রেণী, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০০৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত
সংকলন, রচনা ও সম্পাদন
ড. এস. এম. লুৎফর রহমান
ও আব্দুল মান্নান মিয়া
পৃষ্ঠা– ৯৬ তে বলা হয়েছে যে,
'কুলপতি ইব্রাহিম এই সহানুভূতি শিক্ষা ও সাম্যের শিক্ষা দানের জন্যই 'ইতর-ভদ্র' নির্বিশেষে আল্লাহর সকল সন্তানকে আরাফাত ময়দানে সমবেত হইবার জন্য আহবান করিয়াছিলেন।'
এখানে স্পষ্টভাবে আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা কুরআনের অসংখ্য জায়গায় প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ জন্য দেখুন : সুরা ইখলাস ৩; তাওবা ৯:৩০; মায়েদা ৫:১৮; বাকারা ২:১১৬; ইউনুস ১০:৬৮; ইসরা ১৭:১১১; মারইয়াম ১৯:৩৫,৮৮-৯৩; আম্বিয়া ২১:২৬;

ফুরকান ২৫:২; যুমার ৩৯:৪; জিন ৭২:৩; আনআম ৬:১০০-১০১; মুমিনূন ২৩:৯১; সফফাত ৩৭:১৪৯-১৫৩; যুখরুফ ৪৩:১৬,৮১ ।

আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালালকরণ:
'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা', নবম-দশম শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ড. মোহাম্মদ ইউছুফ এবং ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান সম্পাদিত বইয়ের ৮২ পৃষ্ঠায় হারাম বিষয় দ্রব্যের তালিকা ৫ম নাম্বারে বলা হয়েছে–
'দেবদেবী বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশুর গোশত খাওয়া ।' এখানে স্পষ্টভাবে দেবদেবীর নামে উৎসর্গকৃত পশুর গোশত খাওয়াকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে । অথচ পবিত্র কুরআনে তা স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । দেখুন: বাকারা ২:১৭৩; মায়েদা ৫:৩; নাহাল ১৬:১১৫ ।

কুরআন ও হাদিসের বিকৃতি
'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা', নবম-দশম শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ড. মোহাম্মদ ইউছুফ এবং ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান সম্পাদিত বইয়ের ১০৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে–
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ [الأنفال 8: 39]
'তোমরা (ইসলাম ও মানবতাবিরোধী শত্রুর বিরুদ্ধে) লড়াই করবে । যতক্ষণ না ফিতনা ফ্যাসাদ ও অশান্তি চিরতরে নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় । (সুরা আনফাল, আয়াত ৩৯)'
এখানে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উদ্দেশ্য মূলক ভাবে পবিত্র কুরআনের তরজমার ভিতরে 'মানবতাবিরোধী শত্রু' শব্দটি যোগ করা হয়েছে ।

শিশুদের চরিত্র ধ্বংস করার চক্রান্ত :
জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের জন্য প্রণীত নতুন পাঠ্যবইয়ে রয়েছে অশ্লীলতা ও যৌনতার ছড়াছড়ি । একাধিক বইতে বয়ঃসন্ধিকাল, প্রজনন শিক্ষা, কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের আড়ালে ব্লু-ফিল্ম, পর্নোগ্রাফি ও যৌন বিষয় অত্যন্ত খোলামেলাভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।
যেমন, একাধিক পাঠ্যবইয়ে বয়ঃসন্ধিকালের লক্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে, এ সময় শরীরের বিভিন্ন অংশে লোম গজায়, প্রজনন অঙ্গ বড় হয়ে ওঠে, বীর্যপাত হয়, কিশোরীদের স্তন বৃদ্ধি পায়, ঋতুস্রাব ও মাসিক শুরু হয়, উরু ও নিতম্ব ভারী হয় ।
ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর বইতে 'বয়ঃসন্ধিকাল' অধ্যায়ে প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী প্রবন্ধ : ষষ্ঠ শ্রেণীর 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'আমাদের জীবনে বয়ঃসন্ধিকাল' । বইটির ৩৮ থেকে ৫১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চিত্রসহ ওই বিষয়ে বিষদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে । বইটির ৩৯, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯ ও ৫০ পৃষ্ঠায় বয়ঃন্ধিকালের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বীর্য, ঋতুস্রাব ও যৌন আচরণ, ক্ষয়পূরণ বিষয়ে অত্যন্ত খোলামেলা আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে । ৩৯ পৃষ্ঠার পাঠ-১ এর আলোচনায় বলা হয়েছে- ছেলেদের ১০ থেকে ১৫ বছর এবং মেয়েদের ৮ থেকে ১৩ বছর বয়সকালকে সাধারণত বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয় । ছেলেদের শরীরের বিভিন্ন অংশে লোম গজানো, বীর্যপাত হওয়া ইত্যাদি শারীরিক পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে । মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ঋতুস্রাব শুরু হওয়া, কোমরের হাড় মোটা, উরু ও নিতম্ব ভারী হওয়া, বুক বড় হয়ে ওঠার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে । ছেলেমেয়েদের মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে বলা হয়েছে এ সময় নিকটজনের মনোযোগ, যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, আবেগ দ্বারা চালিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে, যৌনবিষয়ে চিন্তা আসে এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে । পাঠ্যসূচিতে এসব বিষয় থাকায় শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে অভিভাবকরাও বিব্রত ও ক্ষুব্ধ । খোদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারাও বিব্রতবোধ করছেন । শিক্ষাবিদরা বলছেন, এসব শিক্ষা কোমলমতি শিশুদের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেবে এবং এতে সামাজিক অস্থিরতা আরও বাড়বে ।

সূফীদের পক্ষে জাল হাদীস ঢুকানো :
র‌্যান্ডের পরামর্শ অনুযায়ী ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য, মুসলিম যুবকদের অন্তর থেকে জিহাদী চেতনার মূলোৎপাটন করার জন্য এবং সূফীবাদকে জনপ্রিয় করার জন্যই সূফীদের তৈরী করা 'নফসের জিহাদকে জিহাদে আকবার বা বড় জিহাদ বলে অখ্যায়িত করা জাল হাদীসটিকে পাঠ্য পুস্তকে ঢুকানো হয়েছে । দেখুন: 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা', নবম-দশম শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ড. মোহাম্মদ ইউছুফ এবং ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান সম্পাদিত বইয়ের ১০৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে–
এরূপ জিহাদকে (নফসের সাথে জিহাদ) কে রাসূলুল্লাহ (সা.) সবচেয়ে বড় জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন । তিনি বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বলেছেন:
رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوْا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرِ
'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের (আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ) দিকে ফিরে এসেছি ।'
অথচ এটি একটি জাল হাদীস । যা ইংরেজদের খুশি করার জন্য গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও একদল পীর সূফীদের তৈরী করা আরবী বাক্য ছাড়া কিছুই নয় । দেখুন: তাখরীজু আহাদীসিল কাশ্‌শাফ ২য় খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮২৫; আদ্ দুরারুল মুনতাছিরাহ ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ ১ম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা; মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ তানজীমুল আশ্‌তাত -এর প্রথম খন্ডের

৬৯ পৃষ্ঠা; “মাশারিউল আশওয়াক্ব ইলা মাসারী‘উল উশ্‌শাক্ব” কিতাবের ভূমিকা; ফাতওয়ায়ে আজিজীর ১০২ পৃষ্ঠা; মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১১খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা; আদ্দুরারুল মুনতাছিরা: ১/১১, আল আহাদীস লা তাসিহ্‌হু, ১/৫, কাশফুল খিফা ১/৪২৪ ।

এদেশের নাস্তিক মুরতাদদের মূল উদ্দেশ্য :

তুরস্কে যেভাবে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস করে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয় এদেশেও সেই একই পদ্ধতিতে ইসলামকে বিদায় করে সকল ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নব্য কামাল পাশারা মাঠে নেমেছে । এজন্য কামাল আতাতুর্ক নামে রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে, কামল এর জীবনী পাঠ্য পুস্তকে ঢুকানো হয়েছে । পাঠ্য কামাল পাশা তুর্কি জাতীয়তাবাদ সেকুলার বৈপ্লবিক মতাদর্শের আলোকে শাসন পরিচালনা শুরু করেন । তিনি ১৯২৪ সালে খলিফা পদবি ও খিলাফত ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন । কেবল তুর্কিদের সমন্বয়ে তুরস্ক নামক সীমিত ভূখন্ডে সাবেক অটোম্যান সাম্রাজ্য নিজ অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করে । যারা তুর্কি ভাষায় কথা বলত শুধু তাদেরকেই তুর্কি বলে গণ্য করা হতে থাকল । সুখের কথা যে, তুরস্ক নিজে কখনো উপনিবেশের অধীনে শাসিত হয়নি । কামাল পাশা নিজ উদ্যোগে দেশটিকে ইউরোপীয় আদলে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয় । সে ইসলামি শরিয়াকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করেন যা বিগত ১৩০০ বছরে কেউ করেনি । সে ইসলামকে শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবে গণ্য করতে অনুমতি দেয় । সে তুরস্কের অবনতির জন্য ইসলামকে দায়ী করে । সে রাষ্ট্রীয় সব পর্যায় থেকে ইসলামকে বিতাড়ন করে । সেকুলার বৈপ্লবিক মতাদর্শের প্রতি পাশ্চাত্য তাকে উৎসাহ দিতে থাকে । তার আমলে রাষ্ট্রীয় সব পর্যায় থেকে ইসলামি পন্ডিত ও আলেমরা একেবারে উৎখাত হয়ে যায় ।

আরবী ভাষাভাষী মিসরেও প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটে । এখানে ঔপনিবেশিক প্রভুদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে একদল আইনজীবি, যারা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত । তাদের উৎসাহে সেখানেও ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটে । এখানে ১৯৩৬-১৯৪২ সময়কালে বিশিষ্ট ইসলামি পন্ডিত আবদ-আল রাজ্জাক আল-সাহুবির নেতৃত্বে শরিয়া আইনের পরিবর্তে তুরস্কের আদলে ইসলামি পাশ্চাত্য প্রভাবিত সিভিল ও ফৌজদারি আইনের সমন্বয়ে বিস্তারিত বিধিবদ্ধ আইন (Comprehensive Legal Code) তৈরি করা হয় । তাদের দেখাদেখি অন্য আরব দেশগুলোও তা অনুসরণ করে । মিসরে আলেমদের রাষ্ট্রীয় সবপর্যায় থেকে তুরস্কের চেয়েও কড়াভাবে উৎখাত করা হয় । তারা শুধু পারিবারিক আদালতের মধ্যে সীমবদ্ধ হয়ে পড়েন । মিসরে আর শরিয়া আইনকে রাষ্ট্রের আইনের উৎস সিবে গণ্য করা হলো না ।

ইরাকে ১৯২৫ সালে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে তার আওতায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় । গঠিত হয় নির্বাচিত আইন পরিষদ । ইরাকে পারিবারিক বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য ধর্মীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

ভারত উপমহাদেশেও রাজতন্ত্রের আওতায় শরিয়া আইন শুধু পারিবারিক বিষয়াদিতে সীমবদ্ধ করা হয় । এখানেও ঔপনিবেশিক প্রভুরা প্রভাব খাটাতে থাকে । এমনকি পারিবারিক আদালতগুলোও পরিচালিত হতো আধুনিক প্রশিক্ষিত বিচারকদের দ্বারা । বিভিন্ন দেশে গ্রান্ড মুফতির পদ বিলুপ্ত করা হয় । ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফতোয়া দেয়ার কাজও প্রায় বন্ধ হয়ে যায় । এভাবে তুরস্কও সুন্নি আরব দেশগুলোতে আলেম ও ইসলামি পন্ডিতেরা নিছক ধর্মীয় নেতায় পরিণত হন; রাষ্ট্রীয় তথা পার্থিব বিষয় থেকে তাদের দূরে রাখা হয় । আলেমরা মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন যে, তারা নিজেদেরকে শুধু ধর্মীয় কাজের উপযোগী ভাবতে থাকেন । পাশ্চাত্য ও সেকুলার মুসলিমরা আলেমদের সম্পর্কে এমন ধারণা দিতে থাকে যে, তারা পার্থিব বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন । এদেশেও তাই করা হয়েছে । আলেম ওলামাদের শুধু ইমামতি, মুয়াজ্জিনি, দাওয়াত-মিলাদ-খতম, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে । রাষ্ট্রের বিশাল অঙ্গন থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে ।

গণজাগরণ মঞ্চ বনাম মুসলিম জাগরণ ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন :

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে মুসলিম বিশ্বে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে । মধ্যপ্রাচ্য ও বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে রাজা-বাদশাহ ও স্বৈরশাসকেরা নিজ নিজ দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়; ফলে এসব দেশে সংস্কারের ধারণা তীব্র হতে থাকে । সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের পতনের পর পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলো সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকে পড়ে । কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো মুসলিম দেশগুলোতে সচেতন জনগোষ্ঠী রাজা-বাদশাহ ও স্বৈরশাসকদের হটিয়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে । পাশ্চাত্যের পন্ডিতদের কাছে এখন এটি একটি বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে ।

ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামি রাষ্ট্র (অটোম্যান সামাজ্য) বিশ্ববীক্ষণ সম্পর্কে পশ্চাৎপদ ধ্যানধারনার আবর্তে পড়ে উপনিবেশের করাল গ্রাসে পতিত হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম বিশ্বকে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের নামে ভেঙেচুরে বহু জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয় ।

কিন্তু এসব দেশে আজো স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি । সরকারগুলো একে একে ব্যর্থ হয়েছে । কেনো এমন হলো? বেশির ভাগ পন্ডিত মনে করেন, মুসলিম বিশ্বের জনগণের ধারণা হলো, সমাজতন্ত্র ও সেকুলারিজমকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করার কারণেই জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলো ব্যর্থ হচ্ছে । বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সীমিতসংখ্যক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ইসলামের পুনর্জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন । তবে সমাজতন্ত্র ও সেকুলার জাতীয় রাষ্ট্রগুলো ব্যর্থ হতে শুরু করলে জনগণ বলতে শুরু করেছে যে, ইসলামি আদর্শকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখা যাক না । বস্তুত একমাত্র বিংশশতাব্দী বাদে বিগত তেরশ’ বছর ধরে

মধ্যপ্রাচ্য তথা মুসলিম বিশ্বের শাসনব্যবস্থায় ইসলামি নীতি ও আদর্শ ছিল মূল চালিকাশক্তি। ইসলামি মতাদর্শ সর্বদা ন্যায়প্রতিষ্ঠার পক্ষে সোচ্চার এবং অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। বিগত তেরশ' বছর ক্লাসিক্যাল ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় যিনিই ক্ষমতায় ছিলেন (তাদের বৈধতার প্রশ্ন থাকলেও) তারা ইসলামি শরিয়া আইনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। আজকে যারা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছেহন তারা মূলত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথাই বলছেন। কারণ জনগণ দেখছে যে, ইসলামি রাষ্ট্রে ছিল 'আইনের শাসন' আর সেকুলার রাষ্ট্রে চলছে 'ক্ষমতার' শাসন।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম যুবকরা যখন এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে জেগে উঠেছে বিশেষ করে আরব বিশ্বে যুবকদের নেতৃত্বে একের পর এক স্বৈরাচারী শাষকদের ক্ষমতার মসনদ ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার আন্দোলন চলছে এবং সেই আরব বসন্তের হওয়া এদেশেও বইতে শুরু করেছে তখনই এদেশের একদল নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগার র‍্যান্ডের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এদেশের মুসলিম যুবকদের স্পৃহাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার প্রয়াসে 'গণ জাগরণ মঞ্চের' নামে নাস্তিক মঞ্চ তৈরী করেছে। তাদের নানান অনৈতিক ও অনৈসলামিক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন মুখরোচক শ্লোগান এদেশের যুবকদের ধীরে ধীরে ইসলাম বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করছে। কিন্তু তাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে অনুরোধ করবো। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যখনই কোনো বাতিল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই তাদের মোকাবেলায় হকের পতাকা নিয়েও একদল মানুষ তাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে। বাতিল যখন কাবিলের রূপ ধারণ করে মাঠে নেমেছে হক তখন হাবিলের রূপ ধারণ মোকাবেলা করেছে। বাতিল যখন নমরুদের রূপ ধারণ করে মাঠে নেমেছে হক তখন ইবরাহিম (আ.) এর রূপ ধারণ করে মোকাবেলা করেছে। বাতিল যখন ফেরাউনের রূপ ধারণ করে মাঠে নেমেছে হক তখন মূসার (আ.) রূপ ধারণ করে তার মোকাবেলা করছে। বাতিল যখন আবু জাহেল, আবু লাহাবের রূপ ধরে মাঠে নেমেছে হক তখন মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সা.) এর রূপ ধরে মোকাবেলা করেছে। বাতিল যখন মুসলিম খলিফাদের মুখোশ পরে আত্মপ্রকাশ করেছে হক তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) এর রূপ ধরে মোকাবেলা করেছে। বাতিল যখন ভারত বর্ষে ইংরেজদের রূপ ধরে মাঠে নেমেছে হক তখন শাহ আবদুল আজীজ দেহলভীর (রহ.) রূপ ধরে মোকাবেলা করেছে। বাতিল যখন নাস্তিক-মুরতাদ বুদ্ধিজীবি, কবি-সাহিত্যিক ও ব্লগারদের রূপ ধরে মাঠে নেমেছে হক তখন হেফাজতে ইসলামের ব্যানার নিয়ে মাঠে নেমেছে।যুগে যুগে বাতিল যেভাবে হকের কুঠারাঘাতে ধ্বংস হয়েছে বর্তমান যুগের বাতিলরাও সেভাবেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আল্লাহ (সুব.) যথার্থই বলেছেন– جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا 'হক এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।' (সুরা ইসরা, ১৭:৮১)

হেফাজতে ইসলামের নেতৃবৃন্দের প্রতি আমাদের পরামর্শ তাওহীদি জনতার এ গণজাগরনকে কোনো বিশেষ ইস্যুর ভিতরে সীমাবদ্ধ না রেখে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কুরআন-সুন্নাহর রাজ কায়েমের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যান। আরব বসন্তের ন্যায় সকল নাস্তিক-মুরতাদ ও স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়ে সর্বাত্নক জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ুন। ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে মুখে উচ্চারণ করুন 'সকল বিধান বাতিল করো, ওহীর বিধান কায়েম করো', 'সুপার পাওয়ার এক আল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাহ'।

পরিশেষে এদেশের সর্বস্তরের আলেম ওলামা, ছাত্র-শিক্ষক, ইমাম-মুক্তাদি, পীর-মাশায়েখদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন, নিজেদের মাঝে ছোট খাটো এখতেলাফ ও মতবিরোধকে পিছনে রেখে 'ইত্তেহাদ মাআ'ল ইখতেলাফ' এর নীতির আলোকে ঐক্যবদ্ধ হই। একজন ইমামের নেতৃত্বে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে এগিয়ে যাই হেরার আলোকোজ্বল রাজপথের দিকে। কায়েম করি আবার 'খিলাফত আলা মিনহাজ আন নবুওয়্যাহ'। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

নতুন বই পরিচিতি : উন্মুক্ত তরবারী

বই আত্নার খোরাক যোগায়। হাজারো প্রশ্নের শৈল্পীক সমাধান বয়ে আনে কোনো বই। বই মনের কুঠুরীতে জমে থাকা থকথকে আঁধার দূর করে দিতে পারে। সফেদ আলোর উদ্ভাস ঘটাতে পারে নিমিষেই। নাস্তিকতার বেড়াজালে হৃদয়ের সৈকর্য আজ তার বসন্ত হারাতে বসেছে। ঈমানি চেতনা আজ হয়ে পড়ছে জিহাদের দূতনাহারা। এমনি সময় প্রাণপ্রিয় শায়খ জসীমুদ্দীন রাহমানী জাতির রাহবারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। নিরবতার আদল ভেঙে তার কলম আজ শানিত হয়েছে প্রতিবাদের ভাষায়। বাতিলের বিরুদ্ধে তার কলম ঝরিয়েছে আগুনের ফুলকি। রাসুল (সা.) কে কটুক্তির প্রতিবাদে তিনি লিখেছেন নতুন এক অনবদ্য বই 'উন্মুক্ত তরবারী!' বইটির নামকরণেই রয়েছে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা। আর বইটির পরতে পরতে বিবৃত হয়েছে রাসুলের (সা.) সুমহান চরিত্র মাধুরীর অজস্র সৈকর্য আর সৌন্দর্য। কটুক্তিকারীদের ব্যাপারে শরয়ী বিধানের আলোচনা বইটিকে করেছে সমৃদ্ধ। সেই সাথে উসুলে তাকফীরের আলোচনা সোনায় সোহাগা হয়ে দেখা দিয়েছে জ্ঞান পিপাসুদের জন্য। বইটির শব্দের গাঁথুনি, বাক্যের নির্মান, গদ্যের বহমানতা পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে শেষ অবধি। এক নি:শ্বাসে পড়ে ফেলার মত ৯৬ পৃষ্ঠার এই বইটির প্রচ্ছদ যে কারো নজর কাড়বে। এর দাম রাখা হয়েছে মাত্র ৪০ টাকা। প্রিয় পাঠক! আশা করি বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

গোটা কাশ্মীরের ঘরে ঘরে এখন প্রতিটি মানুষই কাশ্মীরী স্বাধীনতার সৈনিক তথা আল্লাহর পথের নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা বা মুজাহিদ। হানাদার ভারতীয় সেনাদের দ্বারা জেল, জুলুম, হুলিয়া, জ্বালাও-পোড়াও, খুন, ধর্ষণ, লুটপাট যতই তীব্র হচ্ছে ততই কাশ্মীরী মুসলমানদের স্বাধীনতার লড়াই তীব্রতর এবং জিহাদী মনোভাব দুর্বার ও শানিত হচ্ছে।

কাশ্মীরী মুজাহিদদের বিজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র

মহিউদ্দিন আকবর

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট 'বৃটিশ-ভারত' স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে 'স্বাধীন-ভারত' হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই ভারতীয় 'চানক্য-পৈতাধারি সেকুলার' নেতৃত্ব মুসলিম অধ্যুসিত আজাদ কাশ্মীরের পুরোটা নিজেদের দখলে নেবার জন্য ষড়যন্ত্রে নেমে পড়ে। ফলে স্বাধীনতা লাভের মাত্র চারমাস অতিবাহিত হতে না হতেই তাদের নির্মম নারকীয় কালো হাতের ভয়াল থাবা জম্মু-কাশ্মীরের মুসলমানদের রক্তে লালে লাল হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে ভারতীয় হানাদার সেনারা মুসলমানদের ওপর লাগাতার সন্ত্রাস, হত্যা, গুম, ধর্ষণ, লুটপাট, বাড়ি-ঘর, মসজিদ, মাদরাসা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ এবং জেল-জুলুমের মাধ্যমে বিগত ছিষট্টি বছরে সরকারি হিসেবেই প্রায় সত্তর হাজার মুসলিম নর-নারীকে হত্যা করেছে। বেসরকারি হিসেবে এই হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা কয়েক লক্ষাধিক। কেবলমাত্র বিক্ষোভ ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমনের নামে হানাদার ভারতীয় বাহিনীর হায়েনারা এ যাবৎ দশ হাজারেরও অধিক কাশ্মীরী মুসলিম নারী ও শিশুকে ধর্ষণ করেছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক কলংকিত অধ্যায়।

কাশ্মীরের মুসলিম জনসংখ্যা মোটামুটি পঁচাত্তর লাখ। অথচ তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনার নামে চানক্যনীতির ধারক-বাহক ভারতীয় সরকার প্রায় সাড়ে চারলাখ ভারতীয় সেনা মোতায়েন করেছে কাশ্মীরে। যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে প্রতিহত করতে নিযুক্ত পাকিস্তানী বর্বর-হানাদার সেনাদের চেয়ে চার গুণেরও বেশি। অথচ তখন স্বাধীনতা প্রত্যাশী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি, যা বর্তমান কাশ্মীরের মুসলিম জনসংখ্যার চেয়ে দশ গুণেরও বেশি। এ থেকেও প্রমাণ হয় যে, ভারতীয়রা আসলে কি চায়?

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক মহল মনে করেন, ভারত মুসলমানদের স্বাধীকার আন্দোলন দমনের নামে মূলত মুসলিমশূন্য কাশ্মীর প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং পুরো কাশ্মীরকে গিলে ফেলতে চায়। কেননা, কাশ্মীরে ভারত যে চারলাখ আগ্রাসী সেনা মোতায়েন করেছে তাদের অবস্থান দু-চার বছরের নয়। ওরা কাশ্মীরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে কাশ্মীরের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অবস্থান করছে প্রায় চব্বিশ বছর ধরে। ১৯৮৯ সালে ভারত প্রথম বারের মত ভারতীয় সেনাদের মোতায়েন করে কাশ্মীরে। তার আগ পর্যন্ত কাশ্মীরে হায়েনার ভূমিকায় ছিলো ভারতীয় পুলিশ এবং তাদের সহযোগী অন্যান্য সংস্থা। ভারতীয় পুলিশ এবং ভারতীয় সেনারা হত্যা, লুট, ধর্ষণের পাশাপাশি এ যাবৎ তিন লাখেরও অধিক কাশ্মীরী নারী-পুরুষ ও শিশুকে চিরকালের মত পঙ্গু করে দিয়েছে। কারাগারে নিক্ষেপ করেছে হাজার হাজার মুসলমানকে।

তারপরও হায়েনারা দমন করতে পারছে না আল্লাহর সৈনিক কাশ্মীরী মুসলমানদেরকে। কেননা, বলতে গেলে এখন আর আলাদা করে কাশ্মীরে মুজাহিদ বাহিনী নেই বললেই চলে। গোটা কাশ্মীরের ঘরে ঘরে এখন প্রতিটি মানুষই কাশ্মীরী স্বাধীনতার সৈনিক তথা আল্লাহর পথের নির্ভীক

মুক্তিযোদ্ধা বা মুজাহিদ। হানাদার ভারতীয় সেনাদের দ্বারা জেল, জুলুম, হুলিয়া, জ্বালাও-পোড়াও, খুন, ধর্ষণ, লুটপাট যতই তীব্র হচ্ছে ততই কাশ্মীরী মুসলমানদের স্বাধীনতার লড়াই তীব্রতর এবং জিহাদী মনোভাব দুর্বার ও শাণিত হচ্ছে। আর তাতে 'আগুনে ঘি ঢালা'র মত ভারতীয় হানাদার সেনারা ঘি ঢেলেই যাচ্ছে। জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢাললে কি অবস্থা হতে পারে তা হয়তো ভারতীয় চানক্য মাথাধারী রাজনীতিকদেরও জানা ছিলো না। ফলে তাদের কূটচাল তাদেরই দিকে বুমেরাং হয়ে ফিরছে।
ভারতীয় নেতাদের আগুনে ঘি ঢালার মাজেজা কিছুটা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। ২০১০ সালে নয় বছরের এক বালক এবং পনের বছরের এক তরুণকে যারপরনাই নৃশংসভাবে হত্যা করে ভারতীয় সেনারা। তাতে ফিলিস্তিনের ইন্তেফাদার মত দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে হাজার হাজার কাশ্মীরী মুসলিম তরুণের হৃদয়। তারা প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে সুনামির প্রচণ্ডতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতীয় হায়েনাদের ওপর। তাদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের আগুন ছড়িয়ে পড়ে শ্রীনগর, বারামুল্লাহ, শোপর ও অন্যান্য নগরে। ফিলিস্তিনের গাজা, রামাল্লাহ ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনী তরুণদের মতই ইট-পাটকেল আর পাথর নিয়ে ভারতীয় হানাদার সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তারা। অভূতপূর্ব এই জাগরণের ফলে আন্তর্জাতিক মহলে তারা ব্যাপক সাড়া জাগায়। ফলে তাদের এই প্রতিরোধ 'ফিলিস্তিনী ইন্তেফাদা'র মত 'কাশ্মীরী ইন্তেফাদা' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এতে হানাদার চক্র চোখে-মুখে অন্ধকার দেখে 'কাশ্মীরী ইন্তেফাদা' দমনের লক্ষ্যে কাশ্মীরের প্রতিটি নগর, গ্রাম ও শহরকে নারকীয় রণাঙ্গনে পরিনত করে। কিন্তু তাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, তাদের এ আগ্রাসনের সাথী বলতে তাদের সাথে আর কেউ নেই। ফলে রণাঙ্গনে নিজেদের বাহিনীর সেনাদের ছাড়া আর সবাইকেই তারা প্রতিপক্ষ তথা শত্রু ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের এই অসহায়ত্ব আজকে তাদের মনে ভয়-ভীতির কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। ফলে নিরুপায় হানাদার সেনাদের কাছে রাজপথে চলমান নিরস্ত্র মানুষদের সবাইকেই হত্যাযোগ্য শত্রু বলে মনে হচ্ছে। তাই কাশ্মীরের নিরপরাধ মানুষদের হত্যা ও গুম করে ফেলা এখন হানাদার ভারতীয় সেনাদের কাছে একটা মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যখন তখন যাকে খুশি তাকেই হত্যা করছে। এক্ষেত্রে যুবক, বৃদ্ধ, নারী, শিশু কাউকেই বাদ দিচ্ছে না।
সাম্প্রতিককালে ভারতীয় এক কুলাঙ্গার মেজরের নির্দেশে তিনজন নির্দোষ লোককে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে নির্বিচার হত্যা করা হয়। কাশ্মীরে যে কোন কাউকে হত্যা করার জন্য সন্ত্রাসী অভিযোগ আনাটাই যেন যথেষ্ট। এজন্য হানাদার ভারতীয় সেনারা কোনরূপ তদন্ত বা বিচারের প্রয়োজনই মনে করছে না। সাম্প্রতিককালে সতের বছর বয়সী আরেক তরুণের মাথায় রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাতের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর হায়েনারা তাকে ধরে নিয়ে যায়। প্রথমে হানাদাররা তরুণটিকে গ্রেফতারের কথা স্বীকারও করে। কিন্তু পরের দিন তার লাশ পাওয়া যায় ফুটপাতে। কাশ্মীরের হাজারো ঘটনা বা হত্যাকাণ্ডের মাঝে এটি একটি উদাহরণ মাত্র। কাশ্মীরের সকল নগরী এবং পথে প্রান্তরে এধরনের ঘটনা এখন খুবই মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর অবস্থা এখন এতটাই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে, খোদ ভারতীয় বিবেকবান কিছু পত্র-পত্রিকায় এসবের লোমহর্ষক রিপোর্ট এখন প্রায়শঃই ছাপা হচ্ছে। এমন কি বিগত বছর চারেক আগের থেকেই দিল্লীর শাসকদের শিখণ্ডী হিসেবে পরিচিত কুখ্যাত কাশ্মীরী শাসক ফারুক আব্দুল্লাহর সরকারও মুখ খুলতে শুরু করেছে। তবে তাদের কণ্ঠ খুবই ক্ষীণ ও দুর্বল।
ফারুকের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলের তেরটি গ্রামের সব পুরুষকে ভারতীয় সেনারা বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত রেখেছে। কিন্তু শ্রমের ধরণ সম্পর্কে তারা কিছু না বললেও বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভারতীয় সেনারা মূলত ওইসব মুসলিম পুরুষদেরকে নেহায়েত ক্রীতদাসের মতই নিষ্ঠুর ও অমানবিক কায়দায় খাটাচ্ছে।
এদিকে একটি বিদেশী এনজিও ইতোমধ্যেই ভারতীয় হানাদার সৈনিকদের ঘৃণ্য জারিজুরি প্রকাশ করে দিয়েছে একটি গণকবর আবিস্কারের মধ্য দিয়ে। এই গণকবরে পাওয়া গেছে বাইশ হাজার নয় শ' তেতাল্লিশটি মুসলিম নর-নারীর লাশ। এই গণকবর আবিস্কারের পর বিবেকবান বিশ্ববাসী এবং তথাকথিত মানবতাবাদিদেরও টনক নড়ে ওঠেছে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ও ভাষ্যকাররা মনে করেন, কেবলমাত্র একটি গণকবরেই যদি প্রায় তেইশ হাজার লাশের সন্ধান পাওয়া যায়– তাহলে এ ধরনের আরও যে কতটি গণকবর আছে আর তাতে সাকুল্যে যে কত লাখ মানুষের লাশকে এভাবে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে তা ভবিষ্যৎই বলে দেবে। এ থেকে ভারতীয় হানাদার সেনা হায়েনাদের যে কুৎসিত, বিভৎস, নিষ্ঠুর, আগ্রাসী ও ভয়ংকর চরিত্র এবং নারকীয়তার চিত্র ফুটে উঠেছে, তা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাক হানাদারদের নারকীয়তার কথাই কেবল নয়– ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রুডলফ হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীএবং আশির দশকের ইরানের

পতিত স্বৈরাচার রেজাশাহ পাহলভীর সাভাক পুলিশের নারকীয়তাকেও হার মানায়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধার এবং গণতন্ত্রের নামাবলীর পৈতা ঝুলিয়ে দিল্লী সরকার আজকে বিশ্ববাসীকে কেমন ধোকাটাই না দিয়ে যাচ্ছে।

তবে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কাশ্মীরীদের স্বাধীনতার এই লড়াই দীর্ঘ দিনের। ১৯৪৮ সালে, যখন এ রাষ্ট্রটি হিন্দুরাজা মহারাজ হরি সিং-এর ষড়যন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিকদের মতের বিরুদ্ধেই ভারতের সাথে যোগ দিয়েছিল তখন থেকেই এই লড়াইয়ের সূত্রপাত। কাশ্মীরী মুসলমানদের এই ন্যায্য সংগ্রামকে ভারতীয় আগ্রাসী শাসকেরা তথাকথিত সন্ত্রাস বললেও বিশ্ববিবেক তা বলে না। তাদের কাছে এটি পবিত্র জিহাদ বা কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা মুক্তিযুদ্ধ। সম্প্রতি সে জিহাদ প্রচণ্ডভাবে বেগবান হয়েছে এবং ভারতীয় আগ্রাসী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। যদিও ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী সরকার কাশ্মীরের প্রতিটি মহল্লা ও রাস্তায় চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সকল ধরনের ভারী আগ্নেয়াস্ত্রসহ সেনাবাহিনী নামিয়েছে– যেমনটি কোন শত্রুদেশের হামলার মুখে সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতায় সেনা মোতায়েন রাখতে হয়।

বর্তমানে ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরের চলমান এ জিহাদের উত্তাপ পাকিস্তানভূক্ত কাশ্মীরে গিয়েও পৌঁছেছে। সাম্প্রতিককালে আজাদ কাশ্মীরের মোজাফফারাবাদে ইউনাইটেড জিহাদ কাউন্সিলের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক পাকিস্তান সফরের একদিন আগে। ইউনাইটেড জিহাদ কাউন্সিল হল কাশ্মীরের জিহাদী সংগঠনগুলোর সম্মিলিত জোট। সেখানে বক্তৃতা করেন আজাদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী রাজা ফারুক হায়দার খান। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আশ্বাস দিচ্ছি, কাশ্মীরের প্রতিটি ঘর পরিনত হবে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বাংকার।'

সেখানে আরও বক্তৃতা করেন ইউনাইটেড জিহাদ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সাইয়েদ সালাউদ্দীন। তিনি বলেছিলেন, 'এখানকার প্রতিটি গলির প্রতিটি তরুণের উপর এটা বাধ্যতামূলক যে, সে জিহাদে অংশ নিবে। এবং বাধ্য করবে ভারতীয় বাহিনীকে নতজানু হতে।"

স্মরণযোগ্য যে, সোভিয়েত দখলদারির সময় ভারতীয় গুপ্তচরেরা আফগানিস্তানে রুশদের ছত্রছায়ায় বসে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদিদের উস্কানী দিয়েছিল। কিন্তু তালেবানদের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ায় তাদের শেষ পর্যন্ত চাট্টিপাট্টি গোল করে আফগানিস্তান থেকে রাতারাতি পালাতে হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে মার্কিনীদের কাছে তালেবানদের পরাজয় এবং অমানবিক আগ্রাসনের মাধ্যমে আমেরিকানদের দখলদারি প্রতিষ্ঠার পর ভারত আবার একই ষড়যন্ত্র শুরু করে। ভারতীয় গুপ্তচরদের হাতে লাগাতার বোমা বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে পাকিস্তানে। বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদিরাও প্রচুর অর্থ এবং প্রশিক্ষণ পাচ্ছে ভারতের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে।

তাই ভারতের সাথে পাকিস্তানের বিরোধ শুধু কাশ্মীর নিয়েই নয়। আরও বহু বিষয় নিয়ে। তবে রাজনীতির হাওয়া এখন ভারতের বিরুদ্ধে। ভারত এখন প্রবলতর এক জিহাদেও মুখোমুখি। বিগত চৌষট্টি বছরেও যে জিহাদকে ভারতীয় সেনাবাহিনী পরাজিত করতে পারেনি আগামী চৌষট্টি বছরেও যে তা পারবে সে আশার গুড়ে বালি। ভারতীয় বাহিনীর কাশ্মীরে চলমান যুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের নকশাল কিংবা আসামের উলফা অথবা নাগাল্যান্ডের নাগা গেরিলা বা মিজোরামের মিজো গেরিলাদের দাবড়ানো নয়। বরং তারচেয়ে বহুগুণ গুরুতর। কারণ, জিহাদের পক্ষ শুধুমাত্র দুটি পক্ষ নয়। এখানে আরেকটি পক্ষ সম্মানিত ফেরেশতাদের নিয়ে হাজির থাকেন। আর সেটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ। তাই প্রকৃত জিহাদের কোন পরাজয় নেই- হতেও পারে না। সেকুলার সেনাবাহিনীর যুদ্ধ থেকে জিহাদের এখানেই মূল পার্থক্য। জিহাদেও বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি অতীতে বিশ্বের অন্যতম অক্ষশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন। পারছে না অভিশপ্ত জারজ আস্তানা ইসরাইল। পারছে না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের অনুগত বিশাল সাংঘাতেরাও। ভারতের অন্ধ নেতৃত্ব সেটা টের না পেলেও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ভারতীয় আগ্রাসী সেনাবাহিনী। কাশ্মীরে জিহাদের বিরুদ্ধে বিজয় যে একেবারেই অসম্ভব সে খবরটি তারা ভারত সরকারকে জানিয়েও দিয়েছে। ভারতের মিডিয়ায় সে খবর প্রচারিত এবং প্রকাশিতও হয়েছে। ফলে পেরেশানি ও ছুটাছুটি শুরু হয়েছে ভারতীয় মোটামাথার মন্ত্রীদের। কারণ, নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যে লড়াই করার ক্ষমতা এসব মন্ত্রীদের নেই। তথাকথিত শান্তির পয়গাম নিয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাকিস্তানে দৌড়-ঝাঁপের মাজেজাটা এখানেই।

বাস্তবিকপক্ষে কাশ্মীর নিয়ে ভারত এখন দিশেহারা। ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল, কাশ্মীরে ভারতের অবস্থা তা থেকে খুব একটা ভিন্নতর নয়। তবে পার্থক্য হল, আমেরিকা ও রুশদের পক্ষে কোমড় বেঁধে লড়বার

মত প্রচুর লোক ছিল। দেশ দুটিতে বহু লোকের মাঝে যেমনি ছিলো মুনাফিক তেমনি সমাজবাদ এবং পুঁজিবাদের প্রতি মোহও ছিল। কিন্তু কাশ্মীরীদের মাঝে এধরনের লোভ-লালসা ও মোহ নেই। বরং তাদের সামনে আছে তাদের সাথে যারপরনাই প্রতারণার ইতিহাস। নিষ্ঠুরতার ইতিহাস। আছে সামরিক আগ্রাসন, প্রহসন, খুন-হত্যা, লুটতরাজের নারকীয় তাণ্ডব, আছে আসমুদ্র-হিমাচল জুড়ে হিন্দু সাম্রাজ্য নির্মাণের গভীর ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, আছে মুসলিম নিধনের বর্বরতম দৃশ্যাবলী, আছে গণধর্ষণ আর বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগের বিভৎস দৃশ্য এবং মুসলিম বিদ্বেষী প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িকতার ইতিবৃত্ত। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদি হিন্দুসম্রাজ্য নির্মাণের এ লড়াই ভারতীয় হানাদার সেনাদের একাকী লড়তে হচ্ছে কাশ্মীরের রণাঙ্গনে- যাদের ৯৯ শতাংশই হিন্দু।

সঙ্গতকারণেই কাশ্মীরের মুজাহিদদের স্বাধীনতার লড়াই এখন আর রাখ-ঢাকের কিছু নয়, কাশ্মীরীদের লড়াই কোনো সেকুলার লড়াইও নয়। আজ এ লড়াই রূপ নিয়েছে পরিপূর্ণ জিহাদে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে রাজনীতির বহুল অংশই হাতছাড়া হয়েগেছে কাশ্মীরের মুনাফিক সেকুলার ও পাকিস্তানের মুনাফিক সেকুলার চক্রের হাত থেকে। কাশ্মীরের জিহাদ নিয়ে ভানুমতির খেল খেলানোর নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হয়ে গেছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হাত থেকেও। অতীতে তিন তিনটি যুদ্ধ করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনি যে অর্জনটুকু করেছিল, কাশ্মীরের মুজাহিদরা চলমান জিহাদে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অর্জন করেছে। ফলে বিপদে পড়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বিপদ বেড়েছে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদিদেরও। আর তাদের বিপদের মুখ্য কারণ হলো, এখন তারা কাশ্মীরের মুজাহিদদের সাথে আলোচনায় বসতে চাইলেও কাউকে আর পার্টনার করতে পারছে না। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আলাপ আলোচনা লাগাতার চললেও তাতে আর কাজের কাজ কিছু হবে না। শত চুক্তি হলেও জিহাদ যে থেমে যাবে সে সম্ভাবনা আর নেই।

তাছাড়া ভারতীয় বাহিনী যে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছে, সেটা বুঝা যায় ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ইতোপূর্বেকার পাকিস্তান সফরের ঝকমারি দেখে। তিনি শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন। অথচ ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ, ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়ে দিয়েছে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সামরিকভাবে সম্ভব নয়। তাই প্রশ্ন ওঠে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই তা কতটুকু সম্ভব? ছেষট্টি বছর ধরে বহুবার বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কথা রাখেনি ভারত। ফলে শান্তি প্রক্রিয়া এক কদমও সামনে আগাতে পারেনি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একগুয়েমি ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে। আলাপ আলোচনায় ভারতের সামান্যতম আগ্রহ থাকলে ছেষট্টি বছর আগেই কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়ে যেত। এত রক্ত ক্ষয়, এত জুলুম, এত অত্যাচার ও এত কালক্ষেপনের প্রয়োজন হত না।

> ভারতের জন্য বিপদের আরও কারণ হলো, আফগানিস্তানে আমেরিকানদের এখন চরম নাজুক অবস্থা। তারাও সেখানে তালেবানদের গাব্বুরে মারের চোটে দিশেহারা। প্রতিদিন সেখানে মার্কিন হানাদার সেনারা কাতারে কাতারে লাশ হচ্ছে। বিগত একযুগ তথা বার বছর লাগাতার যুদ্ধ করেও আমেরিকানদের তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। আরও বার বছর যুদ্ধ করলেও তাদের বিজয়ের সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সর্বসম্মত গণভোটের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। পাকিস্তানের সাথে সাথে ভারতও সে প্রস্তাব মেনে নেয়। জাতিসংঘের ইতিহাসে সেটাই ছিলো সর্ব প্রথম সর্বসম্মতিতে গৃহীত জাতিসংঘের একটি প্রস্তাব। যা বিবদমান দুটি দেশ মেনে নেয়। ফলে মার্কিন এডমিরাল নিমিটজকে কাশ্মীরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু পরে ভারত অনুষ্ঠেয় গণভোটে পরাজয়ের গন্ধ পেয়ে তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু ভেবেছিলেন তার বন্ধু শেখ আব্দুল্লাহ গণভোটে ভারতকে বিজয়ী করতে সহায়তা দিবে। কিন্তু ইতোমধ্যেই শেখ আব্দুল্লাহর মোহ ভঙ্গ হয়ে যায়। ফলে ভারত সরকার তার উপর আস্থা রাখতে পারেনি। অনিবার্যভাবেই ভারত পরাজয়ের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে শান্তি পূর্ণ সমাধানের এই পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। তারপর থেকে লাগাতারভাবে বলা শুরু করে– 'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ'। উপর্যুপরি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ উস্কানীমূলকভাবে একথাও বলতে শুরু করে যে, 'আলোচনায় যদি বসতেই হয় তবে সেটি হবে কাশ্মীরের পাকিস্তানভুক্ত অংশকে কীভাবে ফেরত পাওয়া যায় সেটি নিয়ে'। তাদের শিষ্টাচার বিবর্জিত বাতচিতে জিহাদরত কাশ্মীরীরা যেমনি ক্ষেপেছেন তেমনি পাকিস্তান পক্ষও একে সহজভাবে গ্রহণ করেনি সঙ্গতকারণেই কোনভাবেই কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সাথে আর কোন

আলোচনার আর প্রশ্ন ওঠে না, ওঠতে পারে না।
যুক্তিযুক্ত কারণেই প্রশ্ন আসে, ভারতীয়দের কাছে শান্তিপূর্ণ সমাধানের অর্থ যদি– 'কাশ্মীরের পাকিস্তানভূক্ত অংশকে কীভাবে ফেরত পাওয়া যাবে', সেটি নিয়ে হয়। তবে তো শত বছর আলোচনা চালিয়েও কোনো লাভ হবে না। ভারতের নীতিই হলো "বিচার মানি তবে তালগাছটা আমার"। এরফলে শুধু পাকিস্তান সরকারই নয়, কাশ্মীরীরাও ভারতীয় সরকারের সাথে আলোচনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। আগ্রহ হারিয়েছে অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও। এমনি এক প্রেক্ষাপটে সারা দুনিয়াব্যাপী তুমুল জনপ্রিয়তা এবং গুরুত্ব লাভ করেছে কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধ তথা সর্বাত্মক জিহাদ।
ভারতের জন্য বিপদের আরও কারণ হলো, আফগানিস্তানে আমেরিকানদের এখন চরম নাজুক অবস্থা। তারাও সেখানে তালেবানদের গাব্বুরে মারের চোটে দিশেহারা। প্রতিদিন সেখানে মার্কিন হানাদার সেনারা কাতারে কাতারে লাশ হচ্ছে। বিগত একযুগ তথা বার বছর লাগাতার যুদ্ধ করেও আমেরিকানদের তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। আরও বার বছর যুদ্ধ করলেও তাদের বিজয়ের সম্ভাবনা একেবারেই নেই। বাধ্য হয়ে মার্কিন হায়েনারা এখন পালাবার রাস্তা খুঁজছে। তারা তাদের এই শোচনীয় পরাজয়কে এখন তথাকথিত বিজয় বলে ইজ্জত বাঁচাতে চাচ্ছে। আর পালাবার পর্বটি নিরাপদ করতে দারুণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে পাকিস্তানের উপর। নইলে হাজার হাজার সৈন্য ও বিপুল রসদসামগ্রী নিয়ে নিরাপদে ফেরত যাওয়াই কঠিন হয়ে যাবে। কেননা, ঘরে ফেরার পথে তল্পিতল্পা নিয়ে তো যুদ্ধে লড়া যায় না! তাই এ মুহূর্তে পাকিস্তানের উপর চাপ বেশি প্রয়োগের সুযোগ মার্কিনীদের হাতে নেই। সঙ্গতকারণেই 'কাশ্মীরে পাকিস্তানীদের পরিচালিত জিহাদ থামাও' বলে মার্কিনীরা ভারতের পক্ষাবলম্বন করে যে অন্যায় চাপ প্রয়োগ করে আসছিল সেরূপ চাপ প্রয়োগের সুযোগও এখন আর তাদের হাতে নেই। তাছাড়া আফগানিস্তান যখন সোভিয়েত হানাদার বাহিনীর দখলে, তখন ভারতীয়রা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ফুর্তিতে নির্লজ্জ ডিগবাজি খেয়েছিল! সে খবর মার্কিনীরাও যেমন জানে তেমনি আফগানিস্তানের তালেবানরাও ভুলে যায়নি। তালেবান যোদ্ধারা তাই প্রচণ্ডভাবে ভারত বিরোধী। আফগানিস্তানে তারাই দিনে দিনে শক্তি সঞ্চার করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। ভারতের উপর যে তারা প্রতিশোধ নেবে– সেটাই ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। ফলে যে জিহাদ এক সময় আফগানিস্তানে শুরু হয়েছিল তা-ই এখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে কাশ্মীরের সর্বত্র। এতে ভারতের হৃদপিণ্ড জুড়ে ভয়াল কম্পন শুরু হয়েছে।
তাছাড়া, ইতোমধ্যেই ভারত-পাকিস্তানের সার্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। স্মরণযোগ্য, ভারত পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানের সাথে পানি চুক্তি করেছিল। সে সময় পাকিস্তানের সামরিক ও অর্থনৈতিক সংকট ছিল প্রকট। তাদের চলতে হত বিশ্বব্যাংকের দয়া দক্ষিণার উপর ভর করে। ফলে বিশ্বব্যাংকের চাপেই সে সময় অসম পানি চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয় তারা। এতে ভারত বিপুলভাবে লাভবান হয়। কিন্তু তারপরও ভারত সে চুক্তি না মেনে বিশ্বাসঘাতকের মত একতরফাভাবে পানি লুটে নেয়। বাংলাদেশের সাথে যেমন ভারতীয়রা বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তেমনি পাকিস্তানের সাথেও নির্লজ্জভাবে চুক্তি ভঙ্গ করে পাকিস্তানের প্রাপ্য পানি তুলে নিচ্ছে সকল দ্বিপাক্ষিক নদী থেকে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের সবগুলো নদী এসেছে কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে। ভারত সেগুলোর উপর একের পর এক বাঁধ নির্মাণ করে চলেছে। ফলে রাজনৈতিক বিবাদ এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপদ এখন তুঙ্গে। যদিও পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের আশা নিয়ে ছেষট্টি বছর অপেক্ষা করেছে। কিন্তু এখন যদি পানি-বিবাদে আরমাত্র পাঁচ-সাত বছরও অপেক্ষা করে, তাহলে পাকিস্তানের বিরাট অংশ মরুভূমিতে পরিনত হবে। তাই কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ না হলেও পানি নিয়ে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে। যুগপৎ কাশ্মীরের স্বাধীনতার জিহাদ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাঝে যে ভয়-ভীতি, টানাপোড়েন এবং কাশ্মীর ছেড়ে পালিয়ে বাঁচার যে ত্রাহী ত্রাহী গুঞ্জন উঠেছে– তা ভারতীয় চানক্যনীতির পৈতাধারী নেতৃবৃন্দের বুকেও আশংকার ভয়াল সুর তুলেছে। কাঁপন ধরেছে সেকুলার সাম্রাজ্যবাদি ভারতীয় আগ্রাসী চক্রের বুক-পাঁজরে। চারদিক থেকে বিউগলের লাস্টপোস্টের সকরুণ ধ্বনি উঠেছে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের। সঙ্গতকারণেই অনিবার্য হয়ে উঠেছে স্বাধীন কাশ্মীর প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত সম্ভাবনা। আর সেটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

লেখক: সাহিত্যিক-সাংবাদিক; রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক।
mohiuddinakbar56@gmail.com

ড্রোন হামলা এবং বিশ্বজুড়ে মার্কিন গুপ্তহত্যা

নোমান বিন আরমান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা শক্তি প্রদর্শনীতে ব্যস্ত। এর সহজ পথ হলো যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়া। ইঁদুর মেরে পাহলোয়ান হওয়ার মতই মার্কিনরা বেছে নিয়েছে দুর্বলদের। এই দুর্বল বলতে আমরা সামরিক শক্তির দুর্বলতার কথা বলছি। একই সঙ্গে মানসকি ও বিশ্বাসের দুর্বলতার দিকেও ঈঙ্গিত করছি। সামরিক শক্তির দিক দিয়ে দুর্বলতার নজির আমরা দেখছি, আফগানে, ইরাকে। আর মানসিক বা বিশ্বাসের দুর্বলতার চিত্রটি আমরা পাবো পাকিস্তানে। মোটাদাগে এই তিনটি রাষ্ট্রই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের নিচে বসবাস করছে।

মার্কিনরা ইরাকে আফগানে 'যুদ্ধ' করলেও; বেশ ক'টি দেশে চালাচ্ছে গুপ্তহত্যা। এর প্রথম সারিতেই রয়েছে পাকিস্তান। এরপরে রয়েছে ইয়েমেন। এছাড়া, ইরাক-আফগানে কথিত যুদ্ধের পাশাপাশি সেই গুপ্তহত্যাটাও চলছে প্রকাশ্য ও গোপনে। কীভাবে চলছে এই গুপ্তহত্যা? আমেরিকান সেনারা গোপনে কারো বাড়িতে গিয়ে তাকে মেরে আসছে? অতর্কিত কমান্ডো অভিযান পরিচালনা করে খতম করছে জঙ্গিদের? না। আমেরিকা কোনো সেনা পাঠাচ্ছে না। নিজেদের লোকদের জীবনরক্ষা করতে তারা এখন আশ্রয় নিয়েছে ড্রোন বা চালকবিহীন বিমান হামলার। আমেরিকার নিজেদের স্বীকারোক্তি মতে এ পর্যন্ত (২০০৪-১৩) ৪ হাজার ৭শ' 'সন্ত্রাসী'কে তারা ড্রোন হামলায় হত্যা করেছে। তবে ড্রোন হামলায় নিহতের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। আমরা কিছু পরে সে তথ্যটা পরিবেশন করব। চার হাজার ৭শ' হোক বা তার বেশি হোক। এটা বড় না। প্রশ্ন হলো, এভাবে গুপ্তহত্যা চালিয়ে তারা মানুষ খুন করতে পারে কি না। এই প্রশ্ন নিহত ও তাঁদের স্বজন-স্বদেশে যেমন ব্যাপকহারে উচ্চারিত, তেমনি আলোচিত আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও।

ড্রোন হামলার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিরা। গুপ্তহত্যার অপরাধে ইতোমধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বিরুদ্ধে 'যুদ্ধাপরাধ' অভিযোগ উঠেছে। আমেরিকার খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক নোয়াম চমস্কি বলেছেন, সারা বিশ্বে যে গুপ্তহত্যার অভিযান চলছে তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ভয়েস অব রাশিয়াকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে চমস্কি আরও বলেন, ওবামা হচ্ছেন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী। তাঁর নেতৃত্বেই বিশ্বে গুপ্তহত্যা পরিচালিত হচ্ছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পেন্টাগন ও টুইন টাওয়ারে হামলার পর সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নীতিতে বন্ধু ও শত্রু নির্বাচন শুরু করেন। বলেন, তাঁর এই যুদ্ধে যারা সহযোগিতা করবে না, তারাই সন্ত্রাসী হিসেবে গণ্য হবে।

এরপরই ওই বছরের নভেম্বরের এক কালো রাতে শুরু হয় আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ। চলে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ও তার মিত্রদের সম্মিলিত ধ্বংসযজ্ঞ। বোমা-গুলিতে প্রাণ ঝরতে থাকে দেশটির হাজারো মানুষের।

এরপর বুশ বিদায় হলেন। পরিবর্তনের স্লোগান ও যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট হলেন বারাক (হোসেন) ওবামা। ক্ষমতার পরিবর্তন হলো। বদলালো না রক্তাক্ত মানুষের ভাগ্য। উল্টো শক্তি বৃদ্ধি হলো রক্তপাতে। যুদ্ধে জড়ালেন কঠোরভাবে। পৃথিবীতে

বাড়তে থাকলো আমেরিকার বোমা-গুলিতে নিহত মানুষের সংখ্যা। বুশ প্রেসিডেন্ট থাকাকালেই 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'র সহযোগী দেশ পাকিস্তানে প্রথম ড্রোন হামলা চালানো হয়। ২০০৪ সালে 'সন্ত্রাসীদের' নিপাত করতে পাকিস্তানে গুপ্তহত্যা শুরু করে সিআইএ। এরপর থেকে ড্রোন হামলা চলছে। একটি রাষ্ট্রের ভেতরে এমন হামলা 'সার্বভৌমত্বে'র লঙ্ঘন হলেও তা কানে নিতে না-রাজ মার্কিনরা। এ ক্ষেত্রে 'বন্ধুত্বের' পোশাকি ভদ্রতাটুকু তারা পাকিস্তানের প্রতি দেখায়নি। উল্টো যখন-তখন ড্রোন হামলা চালিয়ে এক অর্থে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তবে বন্ধুত্বের রঙিন চশমায় ঢাকা পাকিস্তানি শাসকদের বিচার-বুদ্ধি সেটা উপলব্ধি করতে পারছে বলে কোনো প্রমাণ এখনো মিলেনি। সার্বভৌমত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর পরও নানা ভয় ও প্রলোভনে পাকিস্তানকে আজ্ঞাবহ করে রেখেছে মার্কিনরা। ড্রোন হামলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মিডিয়া ট্রায়াল অবশ্য পাকিস্তান করেছে। তবে তা লেন্সেই আটকে থেকেছে। মার্কিনরা তা কানে না তুলে ঘোষণা করেছে, ড্রোন হামলা অব্যাহত থাকবেই।

পাকিস্তানের দি ন্যাশন'র মাসিক কাগজ 'নেদায়ে মিল্লাতে'র ২০১২ সালের অক্টোবর সংখ্যায় একটি কলামে ড্রোন হামলার বিশদ ব্যাখ্যা ও পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে। প্রভাবশালী লেখক আনিসুর রহমান ওই কলামে বলেছেন, ২০০৯ সালের ২০ জানুয়ারি বারাক ওবামা ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র তিনদিন পরই পাকিস্তানে ড্রোন হামলা চালানো হয়। ওই হামলায় চারজন শিশুও নিহত হয়। এরপর থেকে ২০১২'র অক্টোবার পর্যন্ত সেখানে ৩১১ বার ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। তিনি বলছেন, এক হিসেবে এতে তিন হাজারেরও বেশি নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়েছেন। যার মধ্যে অন্তত ২০০ শিশু রয়েছে। এতে বুশের সময়ে ড্রোন হামলায় নিহতদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

ড্রোন হামলায় বিশ্বে কতজন নিরপরাধ মানুষ হত্যা করেছে এ ব্যাপারে কখনোই মার্কিনরা তথ্য প্রকাশ করেনি। গুপ্তহত্যার মতই নিহতের সংখ্যাটিও তারা গোপন করে রেখেছে। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি (২০১৩) হঠাৎ

মার্কিন ড্রোন হামলায় নিরপরাধ পাকিস্তানিদের হত্যা করা হচ্ছে উল্লেখ করে তারা বলেছেন, শুধু পাকিস্তানই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের চালকবিহীন বিমান হামলায় অন্যসব অঞ্চলের নিরপরাধ মানুষরাই নিহত হচ্ছেন।

করেই মার্কিন রিপাবলিকান দলের সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম জানিয়েছেন, তার দেশের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা-সিআইএ পরিচালিত ড্রোন হামলায় এ পর্যন্ত চার হাজার সাতশ' মানুষ নিহত হয়েছেন। এটাই এ পর্যন্ত ড্রোন হামলায় নিহতদের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো আমেরিকান দায়িত্বশীল ব্যক্তির স্বীকারোক্তি।

এই সংখ্যা থেকে ওবামার প্রথম সময়ে পাকিস্তানে ড্রোন হামলায় নিহত তিন হাজারের কথা বাদ দিলে, থাকে সতেরোশ'। আফগান, ইরাক, ইয়েমেনসহ অন্যদেশে ড্রোন হামলায় মার্কিনরা ১০ বছরে মাত্র সতেরো শ' মানুষ হত্যা করেছে? এটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। নিহতের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি হবে বলেই সার্বিক বিবেচনায় মনে হয়। কারণ আমেরিকা কোনো এক বা দুই ব্যক্তিকে টার্গেট করে কখনো ড্রোন হামলা চালায়নি। প্রতিটি হামলাই হয়েছে জনবসতি ও স্থাপনাকে লক্ষ করে। সেখানে তাদের প্রচারকৃত 'সন্ত্রাসী' থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। কিন্তু যখনই ড্রোন হামলা হয়েছে তখনই সাধারণ মানুষ ও শিশুরা নিহত হয়েছে।

মার্কিন ড্রোন হামলায় সাধারণ মানুষ নিহত হওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার পর্যবেক্ষক দলের রিপোর্টেও। পাকিস্তানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা ওয়াজিরিস্তান ঘুরে এসে তাঁরা রিপোর্ট করেছেন। ১৫ মার্চ (২০১৩) প্রকাশিত এ রিপোর্টে বলা হয়, 'কৃষকদের একটি দল নিত্য দিনের মতো কাজ করতে মাঠে যাচ্ছেন। হঠাৎ আকাশ থেকে তাদের লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হলো। অনেক দূর আকাশে থাকায় হামলাকারী ড্রোনটি দেখতে পাচ্ছিলেন না তারা; যাতে কোথাও আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু নির্দয় ড্রোনটি দূর থেকেই অব্যাহত ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে তাদের হত্যা করে। অথচ তাদের কেউই 'জঙ্গি' ছিলেন না!

মার্কিন ড্রোন হামলায় নিরপরাধ পাকিস্তানিদের হত্যা করা হচ্ছে উল্লেখ করে তারা বলেছেন, শুধু পাকিস্তানই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের চালকবিহীন বিমান হামলায় অন্যসব অঞ্চলের নিরপরাধ মানুষরাই নিহত হচ্ছেন। যারা নিত্যদিনের মতো কাজ করতে বের হন তারাই এ ধরনের নৃশংস ও ন্যাক্কারজনক হামলার শিকার হচ্ছেন জানিয়ে তারা আরও বলেছেন, ওয়ারিজিস্তানের পশতু-ভাষীরা স্থানীয় সংস্কৃতির কারণে তালেবানদের মতোই পোশাক পরেন। আর এ কারণেই তাদেরও তালেবান মনে করে নির্বিচারে ড্রোন হামলা চালানো হয়। এই হামলা পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৮ হাজার ড্রোন ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করে।

নিউ আমেরিকান ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ২০১২ সালে পাকিস্তানে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে ৪৬ বার,

২০১১ সালে ৭২ ও ২০১০ সালে ১২২ বার। এই সূচকে পাকিস্তানে হামলার সংখ্যা কমে আসলেও বাড়ানো হয়েছে ইয়েমেনে। ২০১১ সালে ইয়েমেনে ১৮টি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছিলো। ২০১২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩টিতে। এর টার্গেট খুব পরিস্কার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে উদীয়মান শক্তিকে নিঃশেষ করতেই সেখানে গুপ্তহত্যার মিশন বাড়িয়েছে। সিএনএনের তথ্যমতে, ২০০১ সালে জর্জ ডব্লিউ বুশ যখন তাঁর 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শুরু করেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছিল মাত্র ৫০টি ড্রোন। আজ সেটা বেড়ে প্রায় সাড়ে ৮ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে চীন। ২০১০ সালের নভেম্বরে মার্কিনদের তাক লাগিয়ে দেয় তারা। ওই বছর জুহাই বিমান প্রদর্শনীতে চীন নিজেদের উদ্ভাবিত ২৫টি ড্রোন উপস্থাপন করে। এসবের কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে সক্ষম। চীন কতগুলো ড্রোনের মালিক কিংবা কতগুলো ড্রোন বানাতে চলেছে, তা এখনো অজানা। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের সমান ক্ষমতাধর হতে চীন জোর চেষ্টা করবে এটা খুবই স্বাভাবিক।

২০১০ সালের আগস্টে ইরান ড্রোন বানানোর ইচ্ছার কথা বলেছিল। সেটি তারা ইতোমধ্যে করেছে। দেশটি সেনাপ্রধান জেনারেল আমির আলী হাজিজাদেহ সম্প্রতি জানান, তাদের তৈরি ড্রোন প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে। এর ফলে ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিব ইরানের ড্রোনের আওতায় এসে গেছে! তবে ইসরায়েল খালি হাতে বসে নেই। অনেক আগেই তারা ড্রোন বানানোর কৌশল রপ্ত করেছে। শুধু তা-ই নয়, বিশ্বের যেসব দেশ ড্রোন বানিয়ে বাণিজ্য করে, ইসরায়েল সেগুলোর অন্যতম প্রধান দেশ। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রি ইতিমধ্যে নাইজেরিয়া, রাশিয়া ও মেক্সিকোর কাছে ড্রোন বিক্রি করেছে।

ধারণা করা হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইসরায়েল ছাড়া আর কোনো দেশের অভিজ্ঞতা নেই। এর বাইরে অস্ট্রেলিয়া ইসরায়েলের কাছ থেকে ড্রোন ধার করে আফগান যুদ্ধে ব্যবহার করেছে বলে সিএনএনর খবরে দাবি করা হয়েছিলো।

পরিসংখ্যানে বলছে, ২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন সরকার, কোম্পানি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬৮০টি ড্রোন নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে কাজ করছিল। ২০০৫ সালে এমন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯৫টি।

যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান ও ইয়েমেনে কথিত শত্রুদের হত্যা করতে অব্যাহতভাবে ড্রোন হামলা করে যাচ্ছে। এর জন্য আন্তর্জাতিক কোনো নীতিমালার পরোয়া করছে না। আফগানে হামলার জন্য পাকিস্তানকে যেভাবে ব্যবহার করেছে দেশটি তেমনি ইয়েমে ড্রোন হামলার জন্য ব্যবহার করেছে সৌদিকে। তাও রীতিমত গোপন ঘাঁটি বসিয়ে। এই খবর দীর্ঘদিন ছিলো অন্ধকারে। চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি মার্কিন পত্রিকা 'ওয়াশিংটন পোস্ট' বোমা ফাটানো এ তথ্য প্রকাশ করে হতবাক করে দিয়েছে বিশ্বকে। পত্রিকাটি লিখেছে, আল-কায়েদা নেতা আনোয়ার আল-আওলাকি ও তাঁর ১৬ বছরের ছেলেকে হত্যা করতে সৌদি আরব গোপন ঘাঁটি থেকে উড়ে গিয়েছিলো ড্রোনটি। মার্কিনদের এই ড্রোন হামলা বা গুপ্তহত্যা বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়াচ্ছে। একই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী ও আক্রান্ত দেশগুলোকে ড্রোন প্রযুক্তি আয়ত্বে নিতে প্ররোচিত ও উদ্বুদ্ধ করছে। এর ফলে আগামি দিনগুলোতে ড্রোনে ড্রোনে যুদ্ধ'র রণপ্রস্তুতি চলছে অনেক দেশেই। আমাদের সীমান্ত লাগোয়া রাষ্ট্র ভারত এর জন্যে বাজেটে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়েছে ৫ দশমিক ২ শতাংশ। ১ মার্চ ২০১৩-১৪ সালের ঘোষিত বাজেটে এ ব্যয় বাড়ানো হয়। ভারতের এই ব্যয় বাড়ানোর ঘোষণা প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানকে অস্বস্তিতে ফেলবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এই দুটি রাষ্ট্রের জন্ম। এরপর থেকে তারা তিনটি বড় ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বিশ্বের অস্ত্র কেনার দিক থেকে শীর্ষ দেশগুলোর একটি ভারত। ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম পার্লামেন্টে বলেন, ২০১৪ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে তিন হাজার ৭৪৫ কোটি মার্কিন ডলার। এ সময়ের মধ্যে এক হাজার ২০০ ডলারের বিনিময়ে ফ্রান্সের কাছ থেকে যুদ্ধবিমান কেনার কথা। এ ছাড়া কয়েক লাখ ডলার দিয়ে যুদ্ধে ব্যবহার করা যায় এমন হেলিকপ্টার ও ড্রোন কেনার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতেই বাজেট বাড়িয়েছে ভারত। সব মিলে পরিস্থিতি উত্তপ্তের দিকেই এগোচ্ছে। শক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াই চিরয়ত। এটা হবেই। তবে এর ফলে যদি অস্তিত্বই বিপন্ন হতে চলে তাহলে আর কার জন্য শক্তির মহড়া। এই সহজ বিষয়টি শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো সহজে উপলব্ধি করলে বেঁচে যাবে এই পৃথিবী।

নোমান বিন আরমান : সাংবাদিক
numanbinarmanbd@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান ও ইয়েমেনে কথিত শত্রুদের হত্যা করতে অব্যাহতভাবে ড্রোন হামলা করে যাচ্ছে।

আল্লাহর সৈনিক

ড. মিসকীন হেজাযী
ভাষান্তর : মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের জন্য এক নিঃসীম প্রেরণার আধার, এক অবিনাশী শক্তি ইমাম শামিল (রহ.)। তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি, ক্ষমতালোলুপ আগ্রাসী রুশ জারের আধুনিক সমরায়োজনের মোকাবেলায় প্রায় অর্ধশত বছরব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন তিনি। দীর্ঘ সময়ের এই শত-শত যুদ্ধের একটিতেও জয়ী হতে পারেননি ক্ষমতাদর্পী রুশ জার। কিন্তু শেষযুদ্ধে স্বাধীনতা হারায় কাফকাজ। কেনো? কিসের অভাব ছিলো ইমাম শামিলের? ইমাম শামিলের পক্ষে জারের পতন ঘটানো সম্ভব ছিল। কিন্তু ফলাফল উলটো হল কেনো? সেই রক্তাক্ত ইতিহাস নিয়ে রচিত হল অনবদ্য উপন্যাস 'আল্লাহর সৈনিক'। বইটির কোথাও কল্পনার আশ্রয় নেই। নেই অঙ্গ-ঔজ্জ্বল্যে শ্বপ্রসাধনির রঙের বাহার। এত আছে উনিশ শতকের ষোলো সাল থেকে উনষাট সাল পর্যন্ত ককেশাশের প্রান্তরে-কন্দরে, পাহাড়ের শীর্ষে-পাদদেশে, ঘন জঙ্গলের আড়ালে, পর্বতমালার বাঁকে-বাঁকে এক আপসহীন লড়াকু বীর যোদ্ধার সুউচ্চ হিম্মতের স্বার্ণালি ইতিহাস, যে ইতিহাস পাঠে আজও শিহরিত হয় মুমিনের তনুমন, উথলে ওঠে ঈমানের জোশ। আছে উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ, ইতিহাসের উপাদান এবং উজ্জীবিত মুমিনের জেগে ওঠার আহবান।

এক

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আড়াই দশক সমাপ্তির পথে। অথচ, আধুনিকাতার কোনো ছোঁয়া এখানে চোখে পড়ে না। এ যেনো আদি পৃথিবীর অবিকৃত এক জনপদ। তবে এখানকার মানুষের মন ও মানসের সাথে আরবীয় প্রকৃতির অবিশ্বাস্য রকম সাযুজ্য লক্ষ্যণীয় বটে। যেমন, একজন খুনীও যদি নিরাপত্তা কামনা করে নিহত ব্যক্তির পিতার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করে, তবে তাকে জামাই-আদরে আপ্যায়িত করা হয়, তার যথাসাধ্য আদর-যত্ন করা হয়। তদের পরিভাষায় একে 'কানাক্' বলা হয়। নিহত ব্যক্তির পিতা ততক্ষণ পর্যন্ত ঘাতকের নিরাপত্তা ও খাতির-যত্নে একপা খাড়া থাকে, যতোক্ষণ না সে স্বেচ্ছায় বিদায় নেয়। আশ্রিত ঘাতক যেখানে যেতে চায়, নিহতের আত্মীয়-স্বজন তাকে সেখানে পৌছিয়ে দেয়। কিন্তু যদি তারা কখনো কোনো হত্যার প্রতিশোধ গ্রহনে উদ্যত হয়, তবে পাহাড়ের অগম্য চূড়া, গহীন জঙ্গল ও সমুদ্রের গভীরতম তলদেশে ঠাঁই নিলেও তার রক্ষা নেই। চরিত্রে জেদী ও প্রতিশোধপরায়ণ এই মানুষগুলো গর্বের সাথে বলে, 'অথৈ সমুদ্রের পাহাড় সমান উর্মিমালাও যদি ঘাতককে তার মায়ার চাঁদরে লুকিয়ে রাখে, তবুও তাকে খুঁজে বের করতে আমরা সক্ষম।

ঘাতক যদি হিংস্র ব্যাঘ্রের উদরেও আশ্রয় নেয়, সেখান থেকেও

তাকে ছিনিয়ে আনতে আমরা অকুতোভয়।'

পৃথিবীর সবচে, সুশ্রী সুঠাম মানুষদের অধিবাস এই পাহাড়-উপত্যকা। এ হলো আমাদের স্বপ্নের, রূপকথার গল্প, সাহিত্য ও গীতিকথার সেই কোকাব শহর। কোকাব শহরের পরীদের কথা আরবী, উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। আসলে কোকাবের বাসিন্দারা জিন-পরী নয়। তবে সেখানের নারীরা পরীর চেয়েও রূপসী। তারা পরীর মতো মুক্ত বিহঙ্গে ডানা মেলে উড়ে না বটে, তবে পরীরাও তাদের রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে পড়ে। এ কারণে কোকাবের নারীদেরকে অপূর্ব সুন্দরী পরীদের সাথে তুলনা করা হয়।

এই অঞ্চলটির সঠিক নাম কোকাব নয়– কাফকাজ। ইংরেজিতে ককেশাশ। কেউ বলে কোহেকাফ। আল্লাহর এক অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই কাফকাজ। পৃথিবীর এক প্রাচীনতম জনপদ। ইরান থেকে এই দেশটি বেশি দূরে নয় বলেই বোধ হয় ইরানের বিশ্বখ্যাত কবিরা ফারসী কাব্যের অসংখ্য উপমা গ্রহণ করেছে।

কাস্পিয়ান সাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই কাফকাজ পর্বতমালা। দৈর্ঘ নয় শত মাইল, প্রস্থ কোথাও পঞ্চাশ মাইল, কোথাও একশত পঞ্চাশ মাইল। পর্বতমালার এই নিশ্চিদ্র ধারাকে 'সেকান্দারী প্রাচীর' বলা হয়। সেকান্দর আজমের সসৈন্য প্রলয় তা-ব রুখে দিয়েছিলো এই কুদরতী প্রাচীর। অনেকে বলে, এই সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর, যা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ আটকে রেখেছে।

এই ভূখন্ডের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে ঐতিহাসিক জুদী পাহাড়ের (কোহে আররাত) অবস্থান। মহাপ্লাবনের সময় নূহ (আ.)-এর কিশতী এই জুদী পর্বতের চূড়ায় এসে ঠেকেছিলো। আর উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে ঊনিশ হাজার ফিট উঁচু আল-বুরুয্ পর্বত, যা 'জিন বাদশাহ' নামে প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন গ্রীকদের বিশ্বাস, আদিকালে এই আল-বুরুয পর্বতের চূড়ায় দেব-দেবীদের মাঝে পরস্পরে অসংখ্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। প্রাচীন সাহিত্যে ও গীতিকথায় লিখিত হয়েছে, এই পাহাড়ের চূড়ায় সী–মোরগ বাস করে। সী-মোরগ তার দু' চোখের একটি দিয়ে নাকি অতীত এবং অপরটি দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করে। যখন সে উড়ে, তখন পৃথিবী কাঁপতে থাকে, যাকে ভূমিকম্প বলা হয়। এই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত রয়েছে 'কোহে কাযবুক', যার উচ্চতা ষোল হাজার ফুট।

গোটা এলাকা সৃষ্টির এক আজব চিড়িয়াখানা। প্রায় প্রতিটি পাহাড় বরফের শ্বেত চাঁদরে ঢাকা। কখনো এই পাহাড় এতো বিশাল বিশাল শীলাখন্ড মাটিতে গড়িয়ে ফেলেছে, যার তান্ডবে বহু জনপদ বিরান হয়ে গেছে। সে যুগের লোকেরা একে দেবতার অসন্তুষ্টি বা সী-মোরগের পক্ষতাড়নার প্রতিক্রিয়া বলে বিশ্বাস করতো।

এই পর্বত শ্রেণীর চূড়া থেকে কয়েক মাইল নিচে ছোট ছোট বহু জনবসতি রয়েছে। সেখান থেকে এসব বসতির কোনোটি সরু গলি পথের মতো। কোনোটি প্রশস্ত।

এই পর্বতশ্রেণী থেকে সৃষ্টি হয়েছে সাগর, নদ-নদী ও প্রণালীসহ বিশটি প্রবাহমান পানির আধার। কোনো নদী সুড়ঙ্গের মতো পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে অবিরাম। কোনো কূপের পানি ঠান্ডা, কোনোটির উষ্ণ, গরম। একই পানি একই পাহাড়, কিন্তু এর কোনোটির পাথর গলিয়ে নির্গত হয় গরম পানি, অপরটি দিয়ে শীতল। এ এক কুদরতের অপার লীলা।

পাহাড়গুলো এতো উঁচু যে, রাতের বেলা মনে হয়, আকাশের তারকাগুলো বুঝি পাহাড়ের দেশে নেমে এসেছে। আলোরা নাচছে। এখানে বুঝি তারকার মেলা বসেছে। সে এক বিমুগ্ধকর অপরূপ দৃশ্য। দিনের বেলা সূর্যের আলো বরফাচ্ছাদিত শুভ্র পাহাড়-চূড়ায় যখন প্রতিফলিত হয়, তখন দেখা যায় কতো আদিমুদ্রায় কিরণমালা খেলছে, নাচছে। সে বিমুগ্ধ দৃষ্টি ফেরানোই তো দায়।

রঙের এ খেলা দ্রুত বয়ে চলে উপর থেকে নীচে- অনেক নীচে। বাতাসের ঝাপটা-খাওয়া মেঘমালা সাদা কালো বা সুরমা রঙের চাঁদর মুড়ি দিয়ে মুক্ত বিহঙ্গে ক্লান্তিহীনভাবে আকাশ-পরীদের মতো উড়ছে। পাহাড় চূড়ায় উঠে নীচে চেয়ে দেখলে বিশাল নদীগুলোকে সরু রেখার মতো মনে হবে। পাহাড়রে পাদদেশে নেমে তাকালে নীচে- আরো নীচে চোখে পড়বে ঘন অন্ধকারে ঠাসা ভয়াবহ অসংখ্য গহীন শুষ্ক কূপ। তাতে পাথর নিক্ষেপ করলে দীর্ঘক্ষণ পর তার পতনের শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে।

আল্লাহ তাঁর কুদরতের শৈল্পিক হাতে অতি যত্নের সাথে কাফকাজের পর্বতশ্রেণীর কাঠামো, শীর্ষচূড়া ও পাদদেশে বিচিত্র রং ও উপকরণ দিয়ে এতো নিপুণভাবে সাজিয়েছেন, যা সত্যিই বিস্ময়কর।

কোথাও রয়েছে কয়েক মাইল উঁচুতে শক্ত পাথরের সমান মাঠ, যা অতি দক্ষ কারিগরের হাতে প্রস্তুত সুপ্রশস্ত দেয়াল বলে মনে হয়। কোথাও গোল, সমান্তরাল, কোথাও চতুর্ভুজ ও ত্রিভুজ কাঠামোর উপত্যকা রয়েছে, যা দেখলে মনে হবে, পাথর কেটে যত্নের সাথে এই উপত্যকাসমূহ মানব বসতির উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে দক্ষ প্রকৌশলীর নকশা অনুসারে।

প্রকৃতির এ অপরূপ পরিকল্পনা ও সাজসজ্জা হৃদয়বান প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই অভিভূত করে ফেলে। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র রয়েছে। তাহলো কুদরতের তৈরি পাথরের বাঁশরী। তীব্র বায়ুর পরশে এই লক্ষ বাঁশরীর সুর লহরী উঁচু ও নিম্নতালে মাতিয়ে তুলেছে এই উপত্যকার প্রাণগুলোকে। মাঝে মাঝে এমন দেয়াল চোখে পড়ে, যা দু'টি পাহাড়কে আলাদা করে বহু দূর চলে গেছে। এই দেয়ালের সঙ্গে হাওয়া আঘাত খেয়ে শিশ বাজিয়ে প্রতিনিয়ত এক বিচিত্র সুরের ঝংকার তুলছে।

এক এলাকায় রয়েছে বিপুল পরিমাণ চেলগুজা, শাহবলুত ও সফেদা বৃক্ষ। অপর এলাকা আখরোট, বেত ও নাসপতিসহ হাজার ধরনের বৃক্ষে ভরপুর। কোথাও দেখা যাবে পালে পালে হরিণ ও বকরী চড়ে বেড়াচ্ছে, ঘাস খাচ্ছে। কোথাও খরগোশরা লাফাচ্ছে। আবার দেখা যাবে বন্য গরু ও মহিষের যুদ্ধ চলছে। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে হিংস্র চিতা ও ব্যাঘ্র। আর তারই পাশে ছুটে বেড়াচ্ছে হনুমান, বানর ও বনবিড়াল।

এসব পাহাড়ি এলাকায় যারা বাস করে তাদের অতি প্রিয় সম্পদ দু'টি- ঘোড়া ও খঞ্জর। নানা প্রকার, নানা জাত ও নানা রঙের ঘোড়া। তাজী সর্বোন্নত জাতের ঘোড়া। স্থানীয় লোকেরা এই তাজী ঘোড়াকে দ্রুতবেগে চলার কারণে 'বাতাসের সন্তান' বলে অভিহিত করে। 'আবলক' ঘোড়ার জন্য তারা জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে।

একবার এক গোত্রপতির যুবক পুত্রের শত্রুপক্ষীয় অপর এক গোত্র নেতার একটি 'আবলক' ঘোড়া পছন্দ হয়ে যায়। অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যুবক তার কাছে গিয়ে বলে, 'বলো, তোমার এই ঘোড়ার দাম কতো?' বিচক্ষণ মালিক বুঝে ফেললো, এই যুবক আমার ঘোড়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাই উত্তরে বললো, 'তোমার মতো বীর যুবককে এই ঘোড়াটি উপহারস্বরূপ দিতে পারলেই আমি আনন্দ পাবো। কিন্তু তোমার পিতা এই শুভেচ্ছা উপহারকে আমার দূর্বলতা মনে করবে। তাছাড়া যেহেতু তোমার পিতা আমার শত্রু, তাই তোমার থেকে মূল্যও নেয়া সম্ভব নয়। আমাদের সমাজে শত্রুর সাথে এ ধরনের লেনদেনের নিয়ম নেই। সত্যিই যদি তুমি আমার 'আবলক' ঘোড়াটি নিতে চাও, তাহলে বিনিময়ে তোমার যুবতী বোনকে আমার হাতে তুলে দাও'।

যুবক আর দাঁড়ালো না। সোজা ঘরে চলে গেলো। তার পিতা তখন ঘরে ছিলো না। এই সুযোগে সে নিজের ষোড়শী সহোদরকে রশি দিয়ে বেঁধে জোরপূর্বক ধরে এনে শত্রু সরদারের হাতে তুলে দিয়ে ঘোড়া নিয়ে বাড়ি ফেরে। ঘটনা জানতে পেরে যুবকের পিতা ছেলের এই আগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা করে। কিন্তু শত্রু-নেতার এই আচরণকে অপমানজনক সাব্যস্ত করে দলবল নিয়ে তার উপর আক্রমণ করে।

এই পাহাড়ি লোকদের সমাজে মানুষের ন্যায় ঘোড়ারও বিভিন্ন বংশ আছে। বংশ অনুপাতে ঘোড়ার মর্যাদাগত তারতম্যও রয়েছে।

এখানকার লোকদের কাছে খঞ্জর ঘোড়া অপেক্ষা অধিক মূল্যবান, অধিক গৌরব ও ঈর্ষার বস্তু। বিভিন্ন প্রকারের খঞ্জর ঘোড়ার ন্যায় পৃথক পৃথক মর্যাদায় অভিষিক্ত। দাশনা কাটারী, খঞ্জর আবদার, হেলালী খঞ্জর, মাহী, আহেন, আফআ, হাদীদ, দোধারী, তেগা, জুস্তা ও কঞ্জল ইত্যাদি।

কঞ্জল সব খঞ্জরের সেরা। কঞ্জল চালনার জন্য অত্যন্ত দক্ষতা ও শক্তির প্রয়োজন। যে কেউ কঞ্জল ব্যবহার করতে পারে না। কঞ্জল চালনার দক্ষতা যার আছে, তাকে অজেয় মনে করা হয়। কঞ্জলের ফলা যাকে স্পর্শ করে, এতো দ্রুত সে মৃত্যুবরণ করে যে, দু' ফোঁটা পানি মুখে নেয়ারও সময় পায় না। মানুষের পেটে তা এমনভাবে বিদ্ধ হয়, যেমন ধারালো ছুরি আলতো আঘাতে তরমুজের ভেতরে ঢুকে পড়ে। প্লেটের ভেতরে ঢুকিয়ে যখন বিশেষ পদ্ধতিতে সেটি টেনে বের করা হয়, তখন আক্রান্ত ব্যক্তির নাড়ি-ভুঁড়ি সব টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

এসব পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের জীবন-চরিত্রে পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও নদ-নদীর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সাহস তাদের পাহাড়ের মত উঁচু ও অটল। হৃদয় বনের মতো বিস্তৃত, বিশাল। চেতনা সমুদ্রের মতো গতিশীল ও বিক্ষুব্ধ। তাদের ব্যক্তিসত্ত্বা পাথরের মতো মজবুত। সে এলাকার গোত্র-সমাজ যেন জীবন্ত পর্বত, তাদের ঐক্যে যেনো শিকলের এক একটি অবিচ্ছেদ্য কড়া। কিন্তু তারা পাহাড়ের মতো একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

সত্ত্বাগতভাবে প্রতিটি গোত্র এক একটি বিশাল পাহাড়, যাকে আপন স্থান থেকে সরানো অসম্ভব। প্রত্যেক মানুষ যেনো একটি বিশাল পাথর, যাকে নিজ অবস্থান থেকে টলানো সাধ্যাতীত। তাদের জীবন নির্বাহের উপকরণ গাছের ফল, বনের শিকার আর যৎসামান্য কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল। উপত্যকাসমূহের যেখানে সমতল জমি আছে, পানি আছে, সেখানে ফসল উৎপাদন করা হয়। কিন্তু এসব কাজ আঞ্জাম দেয় মহিলারা। পুরুষদের কাজ হলো যুদ্ধ করা। আক্রমণ করা আর আক্রমণ ঠেকানো তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তাদের সন্তানরা জন্ম নেয় রণাঙ্গনে। রণাঙ্গনেই তারা লালিত-পালিত হয়, বড় হয়। এক সময় পৈতৃক পেশা লড়াইয়ে অস্ত্র হাতে নেমে পড়ে। দৌড়-ঝাঁপ, রণসাজ তাদের

জীবনের জন্য বাতাসের মতোই আবশ্যক।

সেই দিবসটি তাদের জন্য উৎসবের দিন বলে গণ্য হয়, যেদিন কেউ তাদের উপর আক্রমণ চালায়। কেউ আক্রমণ না করলে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে তারা পরস্পরে যুদ্ধ মহড়ায় অবতীর্ণ হয়। বহুদিন যদি তাদের উপর কেউ হামলা না করে আর তারাও কারও উপর হামলা করার সুযোগ না পায়, তাহলে অগত্যা তারা নিজেরা পরস্পর লড়াই বাধিয়ে দেয়। বীরত্ব, দুরন্তপনা আর কর্মচাঞ্চল্য তারা রক্তের ধারায় লাভ করে। আলস্য ও কাপুরুষতার কোনো প্রশয় নেই এই সমাজে।

কঞ্জল খঞ্জর তাদের এমনি এক পৈতৃক সম্পদ, যা বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়। যে গোত্রের মানুষ কিংবা বাপের সন্তান কঞ্জলের ছত্রছায়ায় জীবন কাটাতে অক্ষম, সমাজে তাদের বেঁচে থাকা অর্থহীন।

তরবারী চালনায় দক্ষতা পুরুষের আবশ্যি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু খঞ্জরের ব্যবহারের বিদ্যা নারীরাও অনিবার্যভাবে অর্জন করে থাকে। কারণ, অনেক সময় তাদেরও যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হয়। তারা যখন ময়দানে নামে, তখন প্রলয় সৃষ্টি করে ছাড়ে।

ইতিহাসে যে ক'জন নামকরা বীরাঙ্গনার উল্লেখ পাওয়া যায়, তারা এই পার্বত্য ভূখন্ডেরই নারী। কখনো কখনো নারীরাই আক্রমণকারীদের মোকাবেলা করতে থাকে। তৈমুর লং দিল্লী জয় করার পর যখন কাফকাজে হামলা চালান, তখন কাফকাজের বীরাঙ্গনা নারীরাই তার সৈন্য বাহিনীকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলো।

বহু বহুকাল পূর্বে কোহেকাফকে পৃথিবীর প্রান্ত মনে করা হতো। অবশেষে যুদ্ধবাজ লোকেরা কোহেকাফের দক্ষিণ প্রান্তরের (বর্তমান বাকুর নিকটবর্তী) সেই পথটি খুঁজে পায়, যা পাহাড় অতিক্রম করে এশিয়ার সাথে মিলিত হয়েছে। আরবরা সেই পথকে 'বাবুল আবওয়া', ইরানীরা 'দরবন্দ' আর গ্রীকরা 'ওরকলান' বা 'দররা দারিয়াল' বলে।

এই পথের সন্ধান পাওয়ার পর কোহেকাফের উভয় দিকের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়ে যায়। বণিক কাফেলার চলাচল শুরু হয়ে গেলে ডাকাতি আর লুটপাটের প্রবণতাও বেড়ে যায়। রাস্তাটির কল্যাণ-অকল্যাণকে এমন এক নদীর সাথে তুলনা করা চলে, যা কখনো তার দু'কূলের মাটি ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কখনোও বা দু'ধারে উর্বর পলি মাটি জমিয়ে কৃষকের মুখে নির্মল হাসি ফোটায়। আবার কখনোও একই সময়ে উভয় তৎপরতা অব্যাহত রেখে মানুষকে যুগপৎ হাসায় ও কাঁদায়।

শত শত বছরের যোগাযোগ সুবিধায় পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলোতে জনবসতির সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। বিশ্ববিখ্যাত বহু সেনাপতি সে সব পার্বত্য বাসিন্দাদেরকে তাদের বৃহৎ রাজ্যের আওতাভুক্ত করার জন্য বহুবার অভিযান চালিয়েছে বটে; কিন্তু এই পার্বত্য বাসিন্দারা পাহাড়ের মতো দৃঢ়তার সাথে মাথা উঁচু করে তাদের মোকাবেলা করেছে। তবুও পরাজয় মানেনি তারা কোনো মহাশক্তির কাছে।

এই পার্বত্য গোত্রগুলো অন্যসব গোত্রের চেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধবাজ ও বহু বৈশিষ্ট্যের জনক। প্রত্যেক এলাকার জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শাসক। শাসকদের কাউকে খান কাউকে বেগ নামে অভিহিত করা হয়। ছোট এলাকার শাসককে বলা হয় বেগ আর বড় এলাকার শাসককে বলা হয় খান। কোন বহি:শক্তি আক্রমণ করলে বেগ-খান একযোগে সর্বশক্তি দিয়ে তাদের প্রতিহত করে। সমস্যা দূর হয়ে গেলে নিজেরা আবার পরস্পরে যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এ হলো তাদের জীবনাচার। বেগকখনোও এক খানের সঙ্গে কখনোও অন্য খানের সঙ্গে হাত মিলায়। ছোট খান আজ বড় যে খানের মিত্র, কাল তার প্রতিপক্ষের বন্ধু হয়ে যায়। এভাবেই চলে তাদের দিনকাল।

কাফকাজ আটটি বড় অংশে বিভক্ত। এর একেবারে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণে কাস্পিয়ান সাগরের সঙ্গে মিলিত এলাকাটির নাম দাগেস্তান। এর সমুদ্রোপকূলীয় পাহাড়গুলো শুলক॥ তবে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে সবুজ-ছোট-বড় ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা।

দাগেস্তানে বেশ ক'টি নদী প্রবাহমান। দক্ষিণ পশ্চিমে চেচনিয়। এখানে চেনে গোত্রের বাস। পশ্চিমের গোত্রের নাম কারথালেতিয়া। চেচনিয়ার সমস্ত পাহাড় সবুজ-শ্যামল এবং বিপুল বনবনানীতে ভরপুর। চেচনিয়ার পশ্চিমে আডলেশিয়ার অবস্থান, যা কোহেকাফের পশ্চিমাঞ্চলের অর্ধেক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। তাতে উসিতু গোত্রের বসবাস। চেচনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে আডলেশিয়ার দক্ষিণে এবং কারতালেনিয়ার পশ্চিমে কবারদার অবস্থান। কবারদা এ অঞ্চলের সবচে' বড় গোত্র।

এ এলাকার বেশিরভাগ জমি সমতল। কোহেফাকের হৃদপিন্ড হল কবারদা। দারুণ উর্বরতা ও ভৌগলিক গুরুত্বের জন্য এর মর্যাদাই আলাদা। কবারদার পশ্চিমে এবং কোহেকাফের একবারে পশ্চিমাঞ্চলের এলাকাটির নাম সার্কাশিয়া। এর সবটুকু ভূমি পাহাড়ে পাহাড়ে ঢাকা।

কোহেকাফের দক্ষিণাংশে ও কারথালেনিয়ার পশ্চিমে মংগ্রেলিয়া, আমরেতিয়া প্রভৃতি অঞ্চল। একেবারে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল- যার অধিকাংশই মরুভূমি– জর্জিয়া নামে খ্যাত।

কোহেস্তানীদের মধ্যে অঞ্চলভেদে ভাষার ভিন্নতাও লক্ষ্যণীয়। কিন্তু প্রত্যেক ভাষায় রচিত হয়েছে তাদের বীরত্বের লোকগাঁথা আর কাব্য কাহিনীর বিরাট ভান্ডার। এর কয়েকটি কাব্যপংক্তি সামান্য পরিবর্তিতরূপে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাভাষি মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়– 'যে লোক মরতে জানে না, সে লড়তেও জানে না। আর যে লড়তে জানে না, সে বেঁচে থাকতে পারে না। লড়তে জানি বলেই আমরা বেঁচে আছি। আমাদের শিশুরা সর্বপ্রথম যে খেলনা নিয়ে খেলা করে, তা হল খঞ্জর।'

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই সব পাহাড়ে এমন কতিপয় বিজেতার আগমন ঘটে, যাদের সাথে সৈন্য ছিলো না, ছিলো না কোনো তরবারী। তাঁরা ছিলেন আর সব বিজেতাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের হৃদয়ে ছিলো না নারীদের প্রতি মোহ। জমি, জনপদ দখলের পরিবর্তে তারা জয় করতেন মানুষের মন। সংখ্যায় ছিলেন তারা যৎসামান্য- হাতেগোনা কয়েকজন। ছিলেন তারা আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মহান শিক্ষার অলংকারে সজ্জিত সোনার মানুষ।

এ সময়ে ইরান ইসলামী সালতানাতের আওতায় এসে গেছে। মুসলমানরা ইরানের সীমান্ত অতিক্রম করে মধ্য এশিয়ায় পৌছে এখানকার ভূখন্ডে এমন সব বীজ বপন করে, যা অংকুরিত হয়ে বড় হয় এবং যার ডালে ডালে পরবর্তীতে সীনা ও আলবেরুনীর মতো অসংখ্য বিশ্ববিমোহিত ফুল। এই সেই ভূখন্ড, উত্তরকালে যেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলো সমরকন্দ, বোখারা, খেওয়া, খোকন্দ ও তুর্কিস্তানের মতো শক্তিশালী ইসলামী রাজ্য। একসময় ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও দীন কেন্দ্র ছিলো এই জনপদ। এর রয়েছে এক গর্বিত ইতিহাস। *(চলবে ইনশাআল্লাহ)*

কুরআন মোদের সংবিধান

– মোঃ আব্দুল মুগনী

নাহি জানে মুসলিম
নিজ পরিচয়,

পরিচয় ভুলে গিয়ে
পথভ্রষ্ট হয়।

আলো ছেড়ে আঁধারে
জীবন কাটায়,

আধারে ডুবে এ জাতি
আলোকে নিভায়।

তবুও জ্বলে ওঠে
প্রজ্বলিত আলো,

এ জ্যোতি নিভাবে হক?
সে পারবে না কস্মিন কালেও।

এ আলোকে করবে কে ক্ষয়?
এটা তো রয়ে যাবে চির অক্ষয়।

এ আলো পাক কুরআন
এটাই তো মোদের জীবন ও সংবিধান

পুনঃচেতনার মন্ত্রণা

– উম্মে যায়িদ

আজ মুসলিমের করুণ দশা
মৃত্যুতে তার সকল ভয়
তাই দিয়ে কি একদিন বীর
করেছিল বিশ্ব জয়?
সেই চেতনা উদ্দীপণা
কিসে তাদের করল ক্ষয়?
চাটুকারিতায় মগ্ন মানুষ
সত্যি এমন নি:স্ব হয়।
রক্ত যে আজ বরফ শীতল
ঘুমিয়ে সবাই রয় বেহুস,
প্রাণ ভাষাহীণ পাথর যেনো
জাগবে পেয়ে কার পরশ?
পরশ পাথর হাতে তাদের
জানে নাকো তার ব্যবহার
ফিরে তাকাও অতীত পানে
জোয়ার জাগুক ফের আবার
এসো আবার বুহ্য ভেদে
ওমর খালিদ সালাউদ্দীন
শত্রু নিপাত করতে এসো
আলোক হবে আবার দ্বীন

মুজাহিদ

মুসাফির আব্দুল্লাহ

মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী
কুরআনি রাজ কায়েম করা ফরজ সবাই জানি।
আল কুরআনের ডাকে সবাই বিলিয়ে দেবো প্রাণ
আল্লাহর জন্য করতে পারি সবকিছু কুরবান।

আল্লাহর আইন করতে কায়েম বিশ্ব ধরার মাঝে
সারা জীবন করব লড়াই মুজাহিদ সেজে।
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে করব জমিন লাল।
আল্লাহর আইন চাই নতুবা যুদ্ধ চিরকাল।

তাগুতের গর্জন শোনে পাইনা কভু ভয়
আমরা মুজাহিদ আমাদের নেই কোনো ক্ষয়।
ওরে নবীন ছুটে এসো আল কুরআনের ডাকে
তাগুত মুক্ত করব আজই রবের জমিনটাকে।

আল্লাহর আইন করতে কায়েম যাক আমাদের প্রাণ
আমরা পাবো রবের কাছে শহীদি সম্মান।
মুসলিম তুমি তরুণ তুমি, তুমিই মুজাহিদ,
জিহাদী গান গেয়ে আমি ভাঙবো তোমার নিদ।

নবী

নাসির বিন আব্দুল মজিদ

নবী, নবী, বিশ্ব নবী
সৃষ্টিকুলের সেরা
আমার নবীর জীবন ছিলো
পবিত্রতায় ভরা।

জান্নাতের মেহমান

সায়ীদ উসমান

অদ্ভুত দৃশ্য

রাসূলে আরাবী (সা.) তাকিয়ে আছেন অবাক চোখে। একপৃথিবী নিঃশব্দ বিস্ময় ঠিকরে বেরুচ্ছে তার আলোকময় চোখ থেকে।
এও কি সম্ভব!
এ কী দেখছেন তিনি!
এ কী অদ্ভুত অলৌকিক দৃশ্য!
উহুদে শহীদ সাহাবাদের দাফন কাফনের প্রস্তুতি পর্ব। ব্যাকুল মৌমাছির মতো রাসুলে আরাবীকে (সা.) ঘিরে থাকতো যারা সেই সব নক্ষত্রদের কয়েকজন আজ অনন্তকালের পথযাত্রী। শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোঁট ছুইয়ে তারা আজ অনন্ত পৃথিবীর বাসিন্দা। তাদের বিয়োগে আজ তিনি যন্ত্রণার কাফনে বন্দি। হাহাকারের দমকা হাওয়া তার ভেতরটা দুমরে মুচড়ে দিচ্ছে। হৃদয়ের কোষে কোষে বেজে চলেছে বেদনার সুর। তার মমতা ও ভালোবাসার অগণিত ঝর্ণা আজ রূপ নিয়েছে বেদনার প্রস্রবণে। তাই শোকাভিভূত হৃদয় নিয়ে তিনি তদারক করছিলেন কাফন পর্ব।
অদ্ভুত দৃশ্যটি তখন থমকে দিলো তাকে। তিনি দেখতে পেলেন আকাশের বাসিন্দা ফেরেশতাদের। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এক শহীদের লাশ নিয়ে। পরম মমতায় আর ভালোবাসায় গোসল দিয়ে চলেছেন তাকে।
রাসূলে আরাবী (সা.) নির্বাক। হৃদয় অলিন্দের অগুনতি বিস্ময় কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে আসছে চোখের ঝর্ণা বেয়ে।
এ কার লাশ!
বুকের ভেতর দাপাদাপি করে প্রশ্নের ঝড়। আরেকটু কাছাকাছি হন রাসূলে আরাবী (সা.)। আর্দ্র চোখের কোমল দৃষ্টি ফেলেন লাশের উপর। এবার চিনতে পারেন তিনি। ভোরের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠে তার পরিচয়।
'এতো আমার হানযালার (রা.) লাশ। আমার হানযালা'! দুঃখের মাঝেও মুচকি হাসেন রাসুলে আরাবী (সা.)। ঠোটের কোণ বেয়ে নেমে আসে চাঁদের আলো। যেনো আঁধারের মাঝে একটু আলোর ঝলকানি। দাফন কাফনে ব্যস্ত সহচরদের লক্ষ করে খুশি আর উচ্ছাসের চূড়ান্ত স্ফূরণ ঘটিয়ে বলে উঠেন রাসুলে আরাবী (সা.)–
'কই তোমরা! দেখে যাও হানযালার সৌভাগ্য।'
রাসুলে আরাবীর (সা.) এ শব্দমালা মহাশূণ্যকে আন্দোলিত করার আগেই আবারো ঝড়ে পড়লো আরো একগুচ্ছ পবিত্র শব্দরাশি–
'দেখে যাও, ফেরেশতারা গোসল দিচ্ছে আমার হানযালাকে'
কাছেই দাফন কাফনে ব্যস্ত সায়েদী (রা.) সচকিত হলেন। তার কানেই প্রথম আছড়ে পড়েছে রাসুলে আরাবীর (সা.) শব্দমালা।
'শহীদের লাশের গোসল!
সেও আবার দিচ্ছে ফেরেশতারা!
এও কি সম্ভব?'

সম্ভব, মনে মনে বলে উঠেন তিনি। রাসুলে আরাবীর (সা.) কথা অসম্ভব হওয়াই তো আরেক অসম্ভব। ব্যস্ততা রেখে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন শহীদ হানযালার (রা.) লাশের দিকে। অদ্ভুত দৃশ্যটি চোখে পড়লো তারও। সেটা তাকে চমকে দিয়ে থমকে দিলো। বিস্ময়ের গরম লু হাওয়া ঝাপটা মারলো তাকে। ঘোরলাগা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।
'টপ টপ করে পানি ঝরছে হানযালার (রা.) মাথা থেকে। সদ্য ডুব দিয়ে উঠা মানুষের মতো ভেজা গাঁ, ভেজা মাথা।' যেনো এই মাত্র গোসল সেরেছেন তিনি।

প্রশ্নের তীর

কাফনের পর দাফন পর্ব সমাপ্ত। আজন্ম সহচর তারকা নক্ষত্রদের ঘুম পারিয়ে রেখে ফিরে চললেন রাসুলে আরাবী (সা.)। বিচ্ছেদ বেদনা ডানা ভাঙা পাখির মতো ঝাপটে যাচ্ছিলো তার কোমল হৃদয়ে। সেই সাথে এক ঝাঁক প্রশ্নের তীর ধীর লয়ে বিদ্ধ করছিলো তাকে।
'কী এমন আমল করেছিলো হানযালা (রা.)!
কেনইবা আসমানের বাসিন্দারা তাকে নিয়ে করেছে পবিত্র আয়োজন!
কেনো ওরা গোসল করিয়েছে তাকে!
আল্লাহর একোন রহস্যময়তা!
জানতে হবে! জানতে এর কূল কিনারা!' দৃঢ় পায়ে হেঁটে চলেছেন রাসুলে আরাবী (সা.)। গন্তব্য শহীদ হানযালার (রা.) বাড়ি।

জিহাদের ডাক

বাসর রাত।
যৌবনের প্রথম প্রহরে বিয়ের নহরে ডুব দিলেন তিনি। সুখ-পুলকের অজস্র মনি-মুক্তো তুলে আনলেন আনসার এই যুবক। নব পরিণিতা স্ত্রীর বাহু ডোরে বিয়ের প্রথম মধুলগ্ন বাসর রাত উদযাপন করলেন হানযালা (রা.)। এবার প্রবিত্রতার আয়োজনের পালা। ফুলশয্যার সুখবোধ ঝেড়ে ফেলে দুজনেই উঠে এলেন কুয়ার কাছে।

বসলেন। স্ত্রী পানির পাত্র তুলে নিলেন হাতে। ভালোবাসার লক্ষ কোটি আবেগ মিশিয়ে পবিত্র পানির ধারা বইয়ে দিলেন স্বামীর মাথায়। তখন

হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে গেলেন হানযালা (রা.)। থামিয়ে দিলেন স্ত্রীর হাত। ‘ওগো শুনতে পাচ্ছো কিছু?’
‘হ্যা কি যেনো ঘোষণা করে চলেছে ঘোষক।’

দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট ঘোষণা স্পষ্ট হতে হতে আছড়ে পড়লো হানযালার (রা.) কানে।
‘চলো চলো জিহাদে চলো। উহুদের ময়দান সামর্থবান যুবকদের ডাকছে। চলো চলো...’

জিহাদের কোকিল যেনো গেয়ে উঠলো জিহাদের আবেগি গান। হানযালার (রা.) হৃদয়ের প্রতিটি কোণে বেজে উঠলো প্রভু প্রেমের সুর। শাহাদাতের ব্যকুলতা হাহাকার ছড়িয়ে দিলো হানযালার (রা.) মনতন্ত্রিতে। তরবারি হাতে সাথে সাথে ছুটলেন উহুদ অভিমুখে।

যাবার সময় কী সদ্য বাহুডোরে বাঁধা পড়া প্রেয়সীকে মনে পড়েছিলো তার? হঠাৎ জীবনের সঙ্গি হয়ে উঠা প্রিয়জনের ভালোবাসা কী একবারও বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছিলো যাবার পথে? নতুন বধূর বিচ্ছেদ বেদনা এক পশলা হাহাকার হয়ে তীরে ফলার মতো বেঁধেনি তার বুকে? নাকি আল্লাহর ভালোবাসার কাছে আর সব ভালোবাসা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলো? আল্লাহ প্রেমের পবিত্র বন্যায় আর সব প্রেম খড়কুটার মতো গিয়েছিলো উড়ে?

ইতিহাস সাক্ষী।
আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গের অপার্থিব ঝর্ণাধারায় স্নাত হওয়ার বাসনা স্ত্রীর ভালোবাসা ভুলিয়ে দিয়েছিলো তাকে। সত্য আর মিথ্যের মাঝে রেখা টেনে দেয়ার এক অদম্য আগ্রহের কাছে পরাজিত হয়েছিলো ভালোবাসার সব মায়াজাল।
সব ভুলে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন উহুদের ময়দানে।

তরবারীর শামিয়ানা

হানযালার (রা.) জীবন যৌবনের সব মায়া বন্ধন এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে প্রবেশ করলেন উহুদ প্রান্তরে। সেখানে তখন হাজারো তরবারীর ঝনাৎকার। আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে চলেছে। হক্ব বাতিলের মিমাংসার লড়াইয়ে হানযালার (রা.) তরবারীও আজ ঝলসে উঠেছে শৈল্পিক ভঙ্গিমায়। লড়তে লড়তে হানযালা (রা.) হারিয়ে গেলেন হাজারো তরবারীর শামিয়ানার নিচে। মক্কার এক কাফের সর্দার পড়ে গেলো তার সামনে। প্রত্যয়দর্পী হানযালার (রা.) তরবারী ঝলসে উঠলো আরো আঁধার বিনাশী আলোর প্রসারি হয়ে। তখন হঠাৎ অপরদিক থেকে হানযালাকে (রা.) আঘাত করলো অন্য এক কাফের। পৃথিবী যেনো থমকে দাড়ালো মূহুর্তেই। রোদ তাতানো মধ্য দুপুরে হঠাৎ যেনো নেমে এলো নিঝুম নিশুতি রাত।

যাবার সময় কী সদ্য বাহুডোরে বাঁধা পড়া প্রেয়সীকে মনে পড়েছিলো তার? হঠাৎ জীবনের সঙ্গি হয়ে উঠা প্রিয়জনের ভালোবাসা কী একবারও বাঁধা হয়ে হয়ে দাড়িয়েছিলো যাবার পথে? নতুন বধূর বিচ্ছেদ বেদনা এক পশলা হাহাকার হয়ে তীরের ফলার মতো বেঁধেনি তার বুকে? নাকি আল্লাহর ভালোবাসার কাছে আর সব ভালোবাসা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলো? আল্লাহ প্রেমের পবিত্র বন্যায় আর সব প্রেম খড়কুটার মতো গিয়েছিলো উড়ে?

ঢলে পড়লেন হানযালা (রা.)। শাহাদাতের অজস্র সুখ বুক ভরিয়ে দিলো তার। জান্নাতের রাশি রাশি প্রাচুর্য মাখা উদ্যান স্বাগত জানালো তাকে। স্বর্গ উদ্যানের প্রশস্ত আকাশে গুঞ্জরিত হলো তার আগমণধ্বনি। পৃথিবীর একপ্রস্থ ইতিহাস আরো সমৃদ্ধ হলো তার শাহাদাতের বর্ণিল বর্ণনায়।

শাহবাগ

আবদুল্লাহ খান

মানুষ নামের অমানুষের
আড্ডা যে শাহবাগে,
জাতির জারয সন্তানেরাই
ওদের ডাকে জাগে

নাস্তিকতার চাষি ওরা
বাসি ওদের মন
পাপাচারের গন্ধ ওরাই
ছড়ায় সারাক্ষণ।

প্রশ্নঃ মহিলারা অন্য কোন পুরুষ বা মহিলার বদলি হজ্জ আদায় করতে পারবে কি?
শামসুল ইসলাম, পটুয়াখালী

উত্তর : হ্যা! মহিলাগণ অন্য মহিলাদের বদলি হজ্জ আদায় করতে পারবে। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। কেননা একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রশ্ন করেছিল তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ করার ব্যাপারে। রাসূল সা. তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী ১৮৫২।)
তাছাড়া মহিলাগণ পুরুষের পক্ষ থেকেও বদলি হজ্জ করতে পারবে। চার ইমামসহ অধিকাংশ আলেমদের মত এটাই। কেননা 'খাসআম' গোত্রের মহিলা তার বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ করার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল। রাসূলুল্লাহ সা. তাকেও অনুমতি দিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী ১৮৫৪।)

প্রশ্নঃ যারা উড়োজাহাজে হজ্জ করতে যায় তারা কিভাবে ইহরাম বাধঁবে?
তামান্না আক্তার, মধুবাগ

উত্তর : যারা উড়োজাহাজে হজ্জ করতে যায় তাদের উচিৎ এয়ারপোর্ট থেকেই ইহরামের কাপড়-চোপড় পরিধানসহ সকল প্রস্তুতি নিয়ে রাখা। যখন উড়োজাহাজ মীকাত বরাবর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। তখন ইহরামের নিয়ত করে নিবে। এবং তালবিয়া পাঠ করবে। আর যদি পূর্বের থেকে কাপড়-চোপড় পরিধানসহ যাবতীয় প্রস্তুতি না নিয়ে থাকে তাহলে উড়োজাহাজে বসেই প্রস্তুত হয়ে মিকাত বরাবর উপর দিয়ে যখন উড়োজাহাজ অতিক্রম করবে তখন ইহরামের নিয়ত করবে। কোনক্রমেই উড়োজাহাজ নিচে আবতরণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না।

প্রশ্ন : শাসক যদি কুফরী করে এবং এতে অনড় থাকে, তার বিরুদ্ধে ঈমানদারদের কি করনীয়?
আব্দুল হক, মগবাজার

উত্তরঃ শাসক যদি কুফরী করে এবং এতে অনড় থাকে, তাহলে তার সাথে যুদ্ধ করা আবশ্যক, এটি ফরযে আইন। আর অন্য সকল বিষয়ের উপর এটি প্রাধান্য পাবে।
১) এই হুকুমটি ঐসব শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে শারীয়াহ ব্যতীত অন্য আইন প্রয়োগ করে।
২) আর এই মুরতাদ শাসকের পক্ষে যদি কোন ব্যাখ্যা না থাকে; তাহলে তাকে সত্ত্বর অপসারণ করা অত্যাবশ্যক।
আর তাকে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে, এতে যদি সে তাওবা করে তাহলে ছেড়ে দেয়া হবে অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে।
৩) আর যদি মুরতাদ শাসক একটি বাহিনীকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে; তাহলে তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যক এবং তার পক্ষে যে যুদ্ধ করবে সেও তার মতই একজন কাফির।
৫) আর মুসলিমরা যদি এটি করতে অক্ষম হয় তাহলে অন্তত এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক।
৬) আর এসব মুরতাদ শাসক ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারদুল আইন, শুধুমাত্র তারাই অব্যাহতি পাবে যাদের পক্ষে শারীয়াহ সম্মত ওযর আছে।
৭) স্বভাবজাত অন্যান্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধের চেয়ে, এসকল মুরতাদ শাসকদের সাথে যুদ্ধ করা অগ্রাধিকার পাবে।
৮) আর এক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত নেই যে, মুসলিম মুজাহিদদের একটি ভিন্ন রাষ্ট্র থাকতে হবে।
৯) অনেকে বলে থাকেন যে, কাফেরদের বাহিনীর মধ্যে নানা কারণে অনেক মুসলিম মিশে আছে; তাদেরকে পৃথক করতে হবে একথারও কোন ভিত্তি নেই। (জিহাদের মৌলিক নীতিমালা-আঃ ক্বাদির ইবনে আঃ আযিয)

জিহাদ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের লিখিত 'দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ' কিতাবটি পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রইল।

প্রশ্ন : মদীনার রাষ্ট্র না মানার কারণে ছয়শত লোকেরা কল্লা কাটা হয়েছিলো। বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন কি?

গত ৪ মার্চ, ২০১৩ ইং তারিখে জনৈক এমপি (মঈন উদ্দিন খান বাদল) বনু কুরাইজার ছয়শত লোকের কল্লা কেটে নেয়া প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন– 'মদীনার রাষ্ট্র না মানার কারণে যদি ছয়শত লোকের কল্লা কেটে নেয়া বৈধ হয় তাহলে বাঙালী উম্মতের বিরোধীতাকারীদের কল্লা কেনো কেটে নেয়া যাবে না?' তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন– 'তার উল্লেখ করা এ তথ্যে ভুল ধরতে পারলে তিনি প্রস্তরাঘাতের শাস্তি মাথা পেতে নেবেন।' সঠিক বিষয়টি জানিয়ে উত্তর দিবেন কি?

আরিফ হোসেন, গোবিন্দনগর, মুন্সিরহাট, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও

উত্তর : কথাগুলো শুধু অসত্য ও বিভ্রান্তিকরই নয়; বরং তা কোনো সংসদ সদস্যসুলভও ছিল না। তার ব্যবহৃত ভাষা ছিল, কুরুচিপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'কল্লা কেটে দেয়া হয়েছে,' 'বাঙালি উম্মত', ভুল প্রমাণ হলে 'প্রস্তর মারা হোক।' তার বক্তব্যের বিষয়ে বলতে হয়, এটি ছিল সত্যের অপলাপ। মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে তিনি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মদীনা রাষ্ট্র না মানার কারণে নবীজী বনি কুরাইজার ৬০০ লোকের কল্লা ফেলে দিয়েছেন।' ইসলামের ইতিহাস ও সিরাতুন্নবীর মোটামুটি খবর রাখেন এমন লোকও বুঝবেন যে, কথাটি মনগড়া। বনু কুরাইজার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হিজরি ৫ম সালের শেষ দিকে। আর মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রথম হিজরিতে। এ পাঁচ বছর বনু কুরাইজার লোকজন মুসলমানদের মতো একই সুযোগ-সুবিধা নিয়েই মদিনায় বসবাস করেছে। বরং বিভিন্ন সময় মদিনা রক্ষার জন্য মুসলমানদের জিহাদ করতে হলেও তাদের তা করতে হয়নি। কিন্তু মদিনার অন্যান্য ইহুদি গোত্রের মতো বনু কুরাইজার লোকজনও রাষ্ট্রের দেয়া নিরাপত্তা ও শান্তির সনদের বিনিময়ে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে চরম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তারা ঐতিহাসিক খন্দক যুদ্ধের সময় প্রকাশ্যে কাফেরদের বহুজাতিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, যা ছিল তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং দীর্ঘ ৫ বছর থেকে রাষ্ট্রের দেয়া শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর ইচ্ছায় খন্দক যুদ্ধে কাফির, মুশরিক ও ইহুদিদের বহুজাতিক বাহিনী আল্লাহর গজবের শিকার হয়ে ব্যর্থ হয়ে ফেরত যাওয়ার পর রাসুলে কারীম (সা.) ও বিশ্বাসঘাতক বনু কুরাইজাকে পাকড়াও করেছেন জিব্রাঈলের (আ.) মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশে এবং তাদের মেনে নেয়া সালিশ সা'দ ইবনে মুআযের (রা.) বিচারের মাধ্যমে তাওরাতের বিধান অনুযায়ীই তাদের শাস্তি নির্ধারিত হয়েছিল।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ وَهُوَ حِبَّانُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ بَنِي مَعِيصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنْ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّه مَا وَضَعْتُهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ

....

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রা.) আহত হয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্রের হিব্বান ইবন আরেকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর উভয় বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীর বিদ্ধ করেছিল। কাছে থেকে তার শুশ্রুষা করার জন্য নবী (সা.) মসজিদে নববীতে একটি খিমা তৈরি করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) খন্দকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন হাতিয়ার রেখে গোসল সমাপন করলেন তখন জিবরাঈল (আ.) তাঁর মাথার ধূলোবালি ঝাড়তে ঝাড়তে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনি তো হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি এখনো তা রেখে দেইনি। চলুন তাদের প্রতি। নবী করিম (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায়? তিনি বনী কুরায়যা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বনু কুরাইয়যার মহল্লায় এলেন। পরিশেষে তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এল। কিন্তু তিনি ফয়সালার ভার সা'দ (রা)-এর উপর অর্পণ করলেন। তখন সা'দ (রা) বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এই রায় দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও সন্তাদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ (মুসলমানদের মধ্যে) বণ্টন করে দেওয়া হবে।.....' (সহিহুল বুখারী- ৪১২২, মুসলিম- ৪৬৯৫)

সুতরাং রাষ্ট্র না মানার কারণে বনু কুরাইজার লোকদের হত্যা করা হয়েছিলো এ বক্তব্য সম্পূর্ণ অসার। তিনি 'বাঙালি উম্মত' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা একটি ইসলামী পরিভাষার সুস্পষ্ট অবমাননা। ধর্মের নূন্যতম জ্ঞান আছে এমন লোকও জানে যে, 'উম্মত' বলা হয় কোনো নবীর দাওয়াতপ্রাপ্ত এবং অনুসারী লোকদের। যেমন হজরত মূসার (আ.) উম্মত, হজরত ঈসার (আ.) উম্মত। অর্থাৎ এটি একটি ধর্মীয় পরিভাষা। কোনো ভাষাভাষী, রাষ্ট্র বা গোত্রের সঙ্গে এটি ব্যবহারের সুযোগ নেই। পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী, ওই সংসদ সদস্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, তার কথা ভুল প্রমাণ করতে পারলে তিনি প্রস্তর নিক্ষেপের সাজা নিতে রাজি আছেন। ইসলামে অবশ্য এ সাজা বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত। তারপরও যদি মাননীয় স্পিকারের মধ্যস্থতায় ও বিজ্ঞ ইসলামিক স্কলারদের সালিশিতে ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং ওই সংসদ সদস্য স্বঘোষিত শাস্তি গ্রহণের আয়োজনটি রাষ্ট্র থেকে মঞ্জুর করিয়ে নেন, তবে আমরা আল্লাহর নামে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজি।

প্রশ্ন : আমাদের রাসুল (সা.) কি সত্যিই ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন?
গত ৪ মার্চ, ২০১৩ ইং তারিখে সংসদে জনৈক মন্ত্রী বললেন আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন। কুরআন সুন্নাহের আলোকে বিষয়টি জানতে চাই
মুহাম্মদ নাঈম, রাজবাড়ী

উত্তর : না, কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী স্বার্থান্বেষী লোকেরা

যুগে যুগে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছে। নতুবা এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মুহাম্মদ (সা.) নিজেই ছিলেন ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল। তিনি কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তা স্বত্তেও যদি তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা এটাকে ধর্ম নিরপেক্ষতা মনে করেন তাহলে তাদেরও উচিৎ কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করে নিজেদেরকে সত্যিকার ধর্ম নিরপেক্ষ প্রমাণ করা। মূলত: আমাদের নবী কেনো, কোনো নবীই ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' (সুরা হজ্জ, ২২ : ৭৮)

ইব্রাহীম (আ.) ইয়াকুব (আ.) নিজেরাও মুসলিম ছিলেন এবং সন্তানদেরকে মুসলিম হওয়ার জন্য নসিহত করেছেন :

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

আর এরই উপদেশ দিয়েছে ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকূবও (যে,) 'হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয় আলাহ তোমাদের জন্য এই দীনকে চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেয়ো না। (সুরা বাকারা, ২:১৩২)

সকলকেই মুসলিম হিসেবেই পরিচয় দিতে হবে। ধর্ম নিরপেক্ষ নয় :

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'? (সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৩)

সকলকেই মুসলিম অবস্থায় মরতে হবে ধর্ম নিরপেক্ষ অবস্থায় নয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আলাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না। (সুরা আল ইমরান, ৩ : ১০২)

মৃত্যুর পরে যখন কবরে প্রশ্ন করা হবে তোমার দ্বীন কি? তখন উত্তর দিতে হবে ইসলাম। ধর্মনিরপেক্ষ নয় :

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

مَا دِينُكَ فَيَقُولُ : دِينِي الإِسْلاَمُ

ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে তোমার দ্বীন কি? উত্তরে বলবে আমার দ্বীন হলো ইসলাম।

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষছাড়া অন্যান্য মাখলুকও মুসলিম :

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তাঁরা সকলেই আনুগত্য করে (মুসলিম হয়ে গেছে) ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে। (সুরা ইমরান, ৩ : ৮৩)

সুতরাং মানুষ এবং জ্বীনদের কিছু বিভ্রান্ত অংশ ছাড়া সকলেই মুসলিম। কেউ ধর্ম নিরপেক্ষ নয়। আর অমুসলিম কিংবা ধর্ম নিরপেক্ষ অবস্থায় যত নেক আমলই করুক না কেনো তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তা মরীচিকা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

আর যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার মত, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে আসবে, তখন সে দেখবে সেটা কিছুই নয়। আর সে সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাবে। অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পরিপূর্ণ করে দেবেন। আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সুরা নুর, ২৪ : ৩৯)

প্রশ্ন : হাদীসে বর্ণিত 'গোরাবা'দের পরিচয় কি?

মুজাহিদ, বছিলা, ঢাকা

উত্তর : গোরাবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيباً وَيَرْجِعُ غَرِيباً فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ ما أَفْسَدَ الناسُ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي

'নিশ্চয়ই দ্বীন অপরিচিত আগন্তুকের ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে এবং অচিরেই সেই অপরিচিত আগন্তুকের মত ফিরে আসবে। সুতরাং কতইনা সৌভাগ্যবান সেই সকল গোরাবাগণ যারা সংশোধন করবে আমার ঐ সকল সুন্নাতকে যেগুলো আমার পরে লোকেরা ধ্বংস করেছে।' (সুনানে তিরমিযী ২৬৩০। হাদীসটি হাসান সহীহ।)
আল্লাহ (সুব:) আমাদেরকে এই যুগের গোরাবা হিসাবে কবুল করুন। আমীন!

প্রশ্ন : আমরা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখি নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদেরও দেখি নাই তাহলে আমরা কি করে জানবো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাদের পথ ও মত কোনটি ছিল? তাছাড়া প্রতিটি ফেরকা বা দলের লোকেরাইতো নিজেদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রকৃত

অনুসারী বলে দাবী করে। তাহলে কোনটি হক ও কোনটি বাতিল তা আমরা কি করে জানতে পারি?
মুহাম্মাদ হাসান, রাজশাহী

উত্তর : হ্যা! এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিদায় হজ্জের ভাষণে এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ

'আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিষ রেখে যাচ্ছি যা শক্তভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো 'কিতাবুল্লাহ' (আল্লাহর কুরআন)। (সহীহ মুসলিম ৩০০৯।)
অপর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّه، وَسُنَّةَ نَبِيِّه

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি তোমদের মাঝে এমন দুটো জিনিষ রেখে যাচ্ছি যেদুটো জিনিষকে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তভাবে ধারণ করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না। সেদুটো জিনিষ হচ্ছে 'আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও রাসূলের সুন্নাহ (সহীহ হাদীস)। (মুআত্তায়ে মালেক ২৬৪০; মুসতাদরাকে হাকেম ৩১৯।)

সুতরাং যদিও আমদের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবাদের কেউ নেই কিন্তু কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে ঠিকই আছে। আমরা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ঐ দুটো জিনিষ থেকেই ফায়সালা নিব। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।' (সুরা নিসা ৪ : ৫৯।)
এ আয়াতে আল্লাহর কাছে প্রত্যার্পণ কর বলতে কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। আর রাসূলের কাছে প্রত্যার্পণ কর বলতে সহীহ হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। অতএব কুরআন ও সুন্নাহর সহিত যার কথা মিলবে তার কথা মানা যাবে। আর কুরআন-সুন্নাহের সাথে যার কথা মিলবে না তার কথা মানা যাবে না সে যতবড় ব্যক্তিই হোক না কেন। আমরা কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে আলেম-বুযুর্গ, মুরুব্বী, পীর-মাশায়েখ, ওলী-আওলীয়াদের পরিমাপ করবো। ওলী-বুযুর্গদের দিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে নয়। আমরা যখনই কুরআন-সুন্নাহের দিকে মানুষকে আহবান করি তখন মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে পীর-বুযুর্গ বা মুরুব্বীদেরকে অনুসরণ করে।
আর বলে এত বড় বড় আলেমরা কি কম বুঝেছেন? তারা কি ভুল করেছেন? ইত্যাদি। না! আর এগুলো বলা যাবে না!! কুরআন-সুন্নাহর সহীহ দলীলের অনুসরণ করতে হবে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কথাই আমাদেরকে অসিয়ত করে গেছেন।

ঘোষণা

সুপ্রিয় পাঠক পাঠিকা! আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ বিদগ্ধ নির্ভরযোগ্য মুফতিয়ানে কেরাম। তাদের কাছে আপনার শরয়ী সমস্যা জানিয়ে জেনে নিতে পারেন সমাধান।

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখুন।

খামের ওপর লিখুন বিভাগের নাম।

এবার ইংরেজি মাসের ৫ তারিখের মধ্যেই পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়।

দৈনন্দিন জীবনে চোখের যত্ন কিভাবে নিবেন

ডা. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

কথায় আছে, লোকে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝে না। কথাটি কিন্তু চোখের ক্ষেত্রেই বেশী প্রযোজ্য। অর্থাৎ মানুষ চোখ থাকতে চোখের মর্যাদা বুঝে না। দাঁত নষ্ট হয়ে গেলে বাঁধানো যায়। কিন্তু চোখ নষ্ট হয়ে গেলে উহা আর বাঁধানো যায় না। অর্থাৎ এই কাজটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়ত্বের বাইরে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা চোখের যত্নের ব্যাপারে মোটেও সচেতন নই। আমরা চোখের কতটুকুইবা যত্ন নেই? চোখের অসুখ হলে ঔষধের দোকানের উপদেশ মতো চোখে ঔষধ লাগাই যার ফলে অনেক সময় বিষময় হয়। অথচ প্রাথমিক অবস্থায় যথার্থ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে অনেক বিপদ এড়ানো সম্ভব ছিলো। অথছ চোখ মানুষের এক মূল্যবান সম্পদ। পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়েই ইহা অর্জন করা সম্ভব নয়। এই যে অতি সূক্ষ্ম, অতি জটিল ও পরম বিস্ময়কর চোখ, সেই চোখ মানুষের কাছে খুব বেশী কিছু দাবী করে না। চোখকে সুস্থ ও কর্মন্য রাখতে মানুষের বেশী শ্রম, বেশী সময় ও বেশী অর্থের দরকার হয় না। দরকার হয় নিয়মিত ভাবে সামান্য একটু পরিচর্যা। সেই সামান্য যত্ন আর পরিচর্যা থেকেও মানুষ চোখকে প্রায় সময়ই বঞ্চিত করে। তার ফলে বহু মানুষের চোখের যত্নের ব্যাপারে মানুষ ততটা সচেতন নয় বিধায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকেই আংশিকভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছে।

চোখ নিজের যত্ন নিজেই নিয়ে থাকে বিভিন্নভাবে। চোখে কোনো কিছু পড়ার আগেই চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি অন্ধকারেও নিজের অজান্তেই তা হয়। চোখের পানি ও চোখের পলক সাধারণ ধূলো, বালি, ময়লা ধূয়ে মুছে দিচ্ছে। চোখের ভিতরে কোনো কিছু আটকে গেলে বা কোনো জীবাণূ দ্বারা চোখ আক্রান্ত হলে চোখের পানি প্রবাহ বেড়ে যায় প্রাকৃতিকভাবে তা নিরাময় করার জন্য। চোখের অবস্থান মুখমন্ডলের এমন এক স্থানে যেখানে নাক, গাল ও কপালের হাড়ের জন্য সরাসরি সহজে কোনো আঘাত লাগতে পারে না। সরাসরি আঘাত লাগলেও অক্ষিগোলকের চারপাশের চর্বি আঘাতের তীব্রতা কমিয়ে দেয়। অক্ষিকোঠরে অবস্থিত গোলাকার চোখটি চোখের পাতা দিয়ে ঢাকা থাকে বলে সর্বদাই সুরক্ষিত। তাছাড়া নেত্রলোম ও ভ্রুর লোম ধূলোবালি আটকায়। সর্বোপরি আছে চোখের পানি, যা সাধারণ অবস্থায় ধূলোবালি ও জীবাণু ধূয়ে ফেলে।

এভাবে চোখ নিজের যত্ন নিজে নিলেও, গুরুত্ব বিবেচনা করে চোখকে আরো সুস্থ, সুন্দর ও কর্মময় রাখতে আমাদের সকলেরই সচেতনতার সাথে এর যত্ন নেয়া উচিত।

যেমন দিনে কমপক্ষে ৩-৫ বার পরিষ্কার পানি দিয়ে চোখ ধূয়ে নিন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী দৈনিক পাঁচ বার অজুর বিধান আছে। রাতে ঘুমানোর আগে চোখ ভালো করে ধূয়ে নেয়া ভালো। এতে সারাদিনে চোখে যে ময়লা জমে তা সহজেই দূর হয়ে যায়। পেশাগত কারণে যদি আপনাকে ধূলোবালি বা ধোঁয়া পরিবেষ্টিত পরিবেশে কাজ করতে হয় তাহলে নিরাপদ ব্যবস্থা হিসাবে আইমাস্ক অথবা পাওয়ারের সাদা বা রঙ্গীন চশমা ব্যবহার করুন।

চোখ মোছার জন্য সব সময় পরিষ্কার ন্যাকড়া, কাপড় বা রুমাল ব্যবহার করুন। কখনো শাড়ী, লুঙ্গি বা শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মোছবেন না। এতে চোখ সংক্রমিত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এবং এভাবেই চোখ ওঠা ও আরো অনেক চোখের রোগ ছড়ায়। চোখ মুখ মোছার জন্য প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কাপড়, তোয়ালে, রুমাল ব্যবহার করা উচিত এবং কোনো চোখে অসুখ হলে ভালো চোখের জন্য আলাদা কাপড় বা রুমাল ব্যবহার করুন।

কাজল বা প্রসাধনী জাতীয় ব্যবহার না করাই উত্তম। যদিও বা ব্যবহার করার ইচ্ছা করেন তবে তা ব্যবহারের জন্য আলাদা কাঠি থাকা উচিত। কখনো ভেজাল সুরমা ব্যবহার করবেন না। সুরমা মানেই এ্যান্টিমনি সালফাইড। কিন্তু বর্তমানে ভেজাল হিসেবে তাতে দস্তা বা সীসার সালফাইড মেশানো হচ্ছে। এগুলো মূলতঃ বিষ। এসব ব্যবহারে চোখের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, চোখে প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। লক্ষ্য করবেন ভেজাল সুরমা লাগালেই চোখে পানি আসে ও চোখ লাল হয়ে যায় ও চুলকানী হয়। অর্থাৎ চোখের পর্দার ক্ষতি হচ্ছে। এ ছাড়া সুরমা লাগানোর শলাকা দ্বারা কর্ণিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে।

নিয়মিতভাবে প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি, হলুদ রংযুক্ত ফলমূল ও কাঁটাসহ ছোট মাছ খাওয়ার অভ্যাস করবেন। পাকা ও হলুদ রংযুক্ত ফলে প্রচুর পরিমাণ বিটা ক্যারোটিন থাকে। তাই এসব খেলে ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত রোগ হয় না।

কোনো অবস্থাতেই হাট-বাজার, ফুটপাতের বা ঔষদের দোকানদারের পরামর্শে কোনো ঔষধ চোখে লাগাবেন না। চোখে ঝাড়-ফুক দেয়া আমাদের দেশে দারুণভাবে প্রচলিত। এটা আদৌ বিজ্ঞান সম্মত নয়। শুধু বিশ্বাস মাত্র। কোনো পানি পড়া, তেল পড়া, গাছন্ত ঔষধ, শামুকের পানি, খাবারের পর প্লেট ধোঁয়া পানি চোখে দেবেন না। এতে কোনো উপকার তো নেই বরং চোখের মারাত্নক ক্ষতি হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় ঝাড়–ফুক, তেলপড়া, পানিপড়া এসব চিকিৎসার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে রোগী ডাক্তারের কাছে যেতে অনেক বিলম্ব করে ফেলে। তাতে রোগ জটিল হয়ে যায় ও চোখের মারাত্মক ক্ষতি হয়। এমন কি চোখ অন্ধও হয়ে যায় যার ভুরি ভুরি নজির আছে আমাদের দেশে।

যদি চোখে ধুলো, বালি বা কুটা পড়ে বা পোকা পড়ে, তাহলে পরিষ্কার পানি

দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন। সাধারণতঃ এগুলো ধুয়ে ফেললে চলে যায়। প্রয়োজনে পরিষ্কার কাপড় বা রুমালে কোনা দিয়ে আলতোভাবে বের করে নিন। এসব ময়লা সাধারণতঃ চোখের পাতার নীচে বা কোণায় পাওয়া যায়। যদি সহজে বের করতে না পারেন তবে চক্ষু ডাক্তারের পরামর্শ নিন। রান্নার সময় কড়াই বা চুল্লী থেকে দূরে থাকুন,বিশেষ করে গরম তেলে কিছু দেয়ার সময় সাবধান হোন। শিশুদের হাত মাটি,বালু বা অন্য কোন কারণে নোংরা হয়ে গেলে সাথে সাথে ধুয়ে ফেলুন।

রঙ্গিন চশমা বা সানগ্লাস ব্যবহার অতি প্রয়োজনীয় নয়। তবে অনেকে অধিক আলোতে আরামবোধ করেন এবং সাইকেল বা মোটর সাইকেল চালানোর সময় বাতাসের ঝাপটা বা পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। চোখের কাজ বেশী করলে চোখ খারাপ হয় না। মহান আল্লাহ আমাদের দেখার জন্যই চোখ দিয়েছেন। টেলিভিশন দেখতে চায় তাদের চক্ষু পরীক্ষা করানো জরুরী_ খুব বেশি বা খুব কম আলোতে ভাল দেখা যায় না। সরাসরি যাতে চোখে আলো না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

ডাক্তারের লিখিত পরামর্শ ব্যতীত কোন ওষুধ চোখে দিবেন না। বিশেষ করে ষ্টেরয়েড আছে এমন ওষধ। মনে রাখবেন লিখিত পরামর্শ ব্যতীত চোখে ওষুধ দিবেন না যদি পরামর্শদাতা আপনার নিকট আত্নীয় ডাক্তারও হন তবুও না হঠাৎ করে যদি এক বা উভায় চোখে দৃষ্টিস্বল্পতা দেখা দেয়, সাথে ব্যথা থাকুক বা না থাকুক ,অতি সত্বর চক্ষু ডাক্তারের পরামর্শ নিন। তদুপরী মহান আল্লঅহতা'য়ালার দেয়া এ বিশেষ নেয়ামত 'চোখ' এর স্বাভাবিক অবস্তা বজায় রাখার জন্য এবং চোখকে আরো সুন্দর ও কর্মময় রাখার জন্য নিম্নের বিষয়গুলোও বিশষভাবে বিবেচনায় রাখা প্রেয়োজন। যেমনঃ

১)সুষম খাদ্য : কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্রাট জাতীয় খাদ্য রোজ প্রয়োজনীয় পরিমানে গ্রহণ করলে শরীরের সঙ্গে চোখও ভাল থাকে। এর খনিজ লবন ও ভিটামিনও সমান দরকার। প্রচুর পরিমানে সবুজ শাকসবজি রোজ খেলে ভিটামিনের অভাব ঘটে না। সমস্ত ভিটামিনের মধ্যে ভিটামিন'এ'সবচেয়ে বেশী দরকার, বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে। বিটা ক্রারোটিন থেকে 'এ' তৈরী হয়। আর শাকসবজিতে ও হলুদ রঙ যুক্ত বিভিন্ন ফলে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন পাওয়া যায়। মাতৃদুগ্ধও বেশী দিন দিতে হবে। ৬ মাস বয়সের পর থেকে ক্যারোটিন সমৃদ্ধ ফল অর্থাৎ হলুদ যুক্ত ফলমূল যেমন- পাঁকা আম, পাঁকা পেঁপে, গাজর, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি ও সুস্বাদু শাকসবজি অল্প অল্প করে দিতে হবে। সব সময় বেশী দামী খাবার দেওয়ার প্রয়োজন নেই ভিটামিন 'এ' এর অভাবে রাতকানা রোগ, শুকনো চোখ(xerosis or dry Eye),কেরাটোম্যলাসিয় (অর্থাৎ কর্নিয়াতে ঘা হয়ে গলে যাওয়া) এবং সবশেষে চোখ পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায়।

২) সঠিক আলোতে লেখাপড়াঃ আমাদের চোখের বিস্ময়কর গঠনের জন্য যে কোন আলোতেই আমরা কিছুক্ষনের মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি দেখা বা লেখাপড়ার জন্য। খুব কম আলোতে যেমন ভাল দেখতে পাই না, তেমনি তীব্র আলোতেও দৃষ্টিশক্তি অনেক কমে যায়। দিনের বেলায় সরাসরি সূর্যালোকে না পড়ে, একটু দূরে বা জানালার দ্বারে বা বারান্দায় পড়াশুনা করলে চোখ সহজে ক্লান্ত হয় না। রাত্রি বেলায় পড়া বা লেখার জন্য টিউব লাইটের আলোই সর্বাপেক্ষা ভালো। টেবিলে বসে পড়াশুনা তে টেবিল ল্যাম্পের আলো বেশি ভাল, কিন্তু তা যেন সরাসরি বই বা খাতার উপর না পড়ে। বরং দেয়ালোর দিকে রেখে যে প্রতিফলিত আলো পাওয়া যায় তা বেশি আরামদায়ক। কাজের গুরুত্ব, তারতম্য ও সূক্ষতার উপর নির্ভর করছে ঠিক কতটা আলো আপনার দরকার।

এর সঙ্গ ঘরের রঙ,পর্দার রঙ, আসবাবপত্র ইত্যাদির উপরও আলোর স্নিগ্ধতা ও চোখের আরাম অনেকটা নির্ভর করে। বর্ণদৃষ্টি রাত্রে কমে যায় বলে রঙিন হরফে লেখা কিছু পড়তে অসুবিধা হবেই।

২) বইয়ের ছাপাঃ যে কোন ভাষায় লেখার মধ্যে কয়েকটি জরুরী বিষয় হলো-হরফের মধ্যে ফাঁক ,শব্দের মধ্যে ফাঁক, বাক্যের মধ্যে ফাঁক এবং লাইনের মধ্যে ফাঁক। সর্বোপরি লেখা হওয়া উচিত সাদা কাগজের উপর কালো হরফে। চকচকে কাগজে ছাপা, রঙিন কাগজে, রঙিন হরফে লেখা, ঝাপসা লেখা দ্রুত লেখা সবই চোখের জহন্য পীড়াদায়ক। বাচ্চাদের বইয়ের ছাপা সর্বদাই পরিষ্কার এবং বড় হরফে হওয়া উচিত। কারণ বাচ্চারা শব্দ পড়ে অক্ষর চিনে। আর বড়দের ক্ষেত্রে পরিষ্কার ছাপা খুবই দরকার এইজন্য যে বড়রা শব্দ পড়ে অক্ষর চিনে নয় বরং অনেকটা একটা মানসিক প্রতিচ্ছবি (psycho-logical impression) দিয়ে ,যা পূর্বেই তার মস্তিষ্কের কোষে সঞ্চিত আছে।

৪) চোখের ব্যয়াম : চোখের স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য তার বিভিন্ন অংশের সুস্থা ও সবলতা সর্বদাই প্রয়োজন। চোখের বিভিন্ন পেশী সর্বদাই কাজ করে চলেছে। তাই এর যত্নও বিশেষভাবে দরকার নিকট দৃষ্টির জন্য উপযোজনAccommodation প্রয়োজন, আর এটা সিলিয়ারী পেশীর কাজ এই পেশীর সংকোচন (Contraction) বা শীথিলতার (Relaxtion) উপর নির্ভর করে নিকট বা দূরের দৃষ্টির স্বাচ্ছন্দ। এই পেশী সমূহের পুষ্টি শরীরের সাধারন পুষ্টির উপরেই নির্ভরশীল। চোখের পেশীর দুর্বলতা যেমন অল্প ট্যারা,সুপ্ত ট্যারা(Latent Squint) বা উপযোজনের দূর্বলতা (Accommodation Weaknedss) ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কাজ থাকলে (যেমন-লেখা,পড়া বা টিভি দেখা) কিছু সময় অন্তর চোখকে একটু বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। দশ পনের মিনিটের জন্য একটু চোখ বুজে থাকুন অথবা দূরের কোন বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন। এতে চোখের পেশীগুলো শিথিল হবে। তাতেই চোখের অনেক আরাম ও উপকার হবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
আস্সালামু আলাইকুম ওয়া
রাহমাতুলাহি ওয়া বারাকাতুহ ।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়া'লার জন্য । জীবন-মৃত্যু, রিযিক্ব-দৌলত, জাহান্নাম-জান্নাত এবং মানুষকে হেদায়েত দান করার ক্ষমতা যার নিয়ন্ত্রণে; সেই আল্লাহ তায়া'লার জন্য । দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি । যিনি আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জিহাদী বাহিনী গঠন করে নিজে একশত পাঁচটি যুদ্ধ দশ বছরে পরিচালনা করে দেখিয়ে গেছেন কিভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হয় । যার আদর্শে তাঁর সাহাবীগণ হাসি মুখে জেল, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করে জাহান্নাম হতে পরিত্রান পেয়ে জান্নাতে চিরস্থায়ী, অতুলনীয় নাজ-নেয়ামত উপভোগ করার জন্য নিজেদের জানমাল বিলিয়ে দিয়ে শহীদ হবার জন্য পাগলপারা । ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা । রাসূল (সাঃ) তাঁর জীবনাদর্শের মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিভাবে লেনদেন ও আচার আচরণ করতে হবে তা বাস্তবতার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন । হক্ব ও বাতিল কি তা পরিষ্কার জানিয়ে ও দেখিয়ে গিয়েছেন । আব্বা, প্রথমেই আপনার পাঠানো প্রস্তাবে স্বাক্ষর সমর্থন করতে পারি নাই বলে মনে দুঃখ ও কষ্ট নিবেন না । আমি বিশ্বাস করি একজন বাবা হিসেবে আপনি ছেলের জন্য বাৎসল্য প্রীতির যথেষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন । এজন্য আল্লাহ আপনাকে ও আপনাদেরকে হেদায়েত ও নাজাতের কারন বানিয়ে দিন । আমিন । নিশ্চয়ই আপনিও অবগত আছেন যে, আমি আপনাকে কত সম্মান, শ্রদ্ধা, অনুগত ও ভালবাসি । আব্বা জীবন মাত্রই তাকে মৃত্যর স্বাদ গ্রহন করতে হবে । এটা আল্লাহর ওয়াদা । (সূরা আম্বিয়া- ৩৫ নং আয়াত) । আমি দৃঢ়তার সাথে জানাতে চাই আমার দ-াদেশ কার্যকর মামলার সাথে কোনভাবেই জড়িত ছিলাম না এবং এ মামলার সকল আসামীগণও ঝালকাঠি জজ হত্যা মামলার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র জড়িত ও অবগত নন । তারা বিচারের সময় খুব জোড়ালো উপস্থাপন করেছেন । কিন্তু সরকারের নির্দেশের প্রেক্ষিতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ ঠিক করে সম্পূরক চার্জসিটে আসামী করে পূর্ব পরিকল্পিত সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করেছেন । আমি ভালো করেই জানি তাগুত সরকারের কোর্টে আপিল করলে কখনও সত্যমত যাচাই না করেই আবারও তাঁর প্রভুদের নির্দেশ তামিল করবে । এটাই বাস্তব সত্য । কেননা আমি যেসব ঘটনায় সত্যই জড়িত ছিলাম সেসব বিষয়ের কোন মামলায় আমাকে এখন পর্যন্ত জড়িত করে কোর্টে হাজির করে নাই । তাই আপনার পাঠানো আপিলের উকালত নামায় স্বাক্ষর করতে পারলাম না বলে দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী ও জাহান্নাম হতে মুক্তি চাই । পিতামাতার আদেশ পালনের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা বলেন: "হে মুমিনগন! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না । তোমাদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে তাহারাই যালিম । বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাহার রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা বানিজ্য; যাহার মন্দা হওয়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান; যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত । আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না ।" (সুরা তাওবাহ:- ২৩-২৪)
উপরোক্ত আয়াতের আলোকে আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্যে আমি আপনাদের অনুরোধ মান্য করতে পারলাম না । কেননা আমি এই মামলার সাথে কোনভাবেই জড়িত না । তারপর সত্য যাচাই না করে মিথ্যাসাক্ষী সংগ্রহ করে অন্যায় ও অবৈধভাবে সরকার রায় দেবার জন্য জজকে নির্দেশ প্রদান করে । তারই প্রেক্ষিতে বিচারক একতরফাভাবে আমার বক্তব্য পরিহার করে মৃত্য দন্ডাদেশ প্রদান করে । আব্বা মনে রাখবেন, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে মুমিনগণ তাগুতের জেল, জুলম, নির্যাতন-নিপীড়ন ও ফাঁসিতে ঝুলে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে দেখিয়ে গেছেন তাগুতের এসব তান্ডবলীলায় তাঁরা কখনও ভীত নয় । স্বয়ং রাসূল (সাঃ) জীবিত থাকা অবস্থায় খুবাইব (রাঃ) কে শুলিতে চড়াইয়া হত্যা করে শহীদ করে দেয়া হয় । ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ সুমাইয়া (রাঃ) কে শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁকে দুই ঘোড়ার সাথে বেঁধে দিয়ে লজ্জাস্থানে বর্শা মেরে হত্যা করে শহীদ করা হয় । তার স্বামী ইয়াসিরকে (রাঃ) মাটিতে গর্ত করে কোমর পর্যন্ত পুঁতে দিয়ে প্রস্তরাঘাতে

হত্যা করে শহীদ করে দেয়া হয়। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, "একদা আব্বাস বিন আরাত (রাঃ) বলেন: ' হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি কি আমাদের সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করবেন না? তিনি বলেন: এখনই ভীত হয়ে পড়লে? জেনে রেখো যে পূববর্তীর একত্ববাদীদের মস্তকের উপর লোহার করাত রেখে তাদের পা পর্যন্ত কেটে দ্বিখন্ডিত করে দেয়া হত, কিন্তু তথাপি তাহারা তাওহীদ ও সুন্নাত হতে সরে পড়তো না। লোহার চিরুণী দিয়ে তাদের দেহের গোশত আঁচড়ানো হতো। তথাপি তারা আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করতো না। আল্লাহর শপথ! আমার এই দ্বীনকে আল্লাহ এমন পরিপূর্ণ করবেন যে, একজন অশ্বারোহী 'সান'আ' হতে 'হাযরামাওত' পর্যন্ত নির্ভয়ে ভ্রমণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোন ভয় থাকবে না।" আব্বা আপনাকে স্মরণ করে দিতে চাই একজন বয়বৃদ্ধ সাহাবী আবু তালহা (রাঃ) এর কথা। তিনি মুহাম্মদ (সাঃ) হতে শুরু করে আবু বক্কর (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), মুয়াবিয়া (রাঃ) ও সর্বশেষ ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সময় কনস্টান্টিনাপোল জিহাদের সময় তাঁর চার ছেলে তাঁকে বলেছিল বাবা তুমি তো এখন বৃদ্ধ এবং রাসূল (সাঃ) হতে চার খলিফা পর্যন্ত অনেক জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলে এ জিহাদে আমরা চার ভাই রওনা হবার জন্য রণ সাজে সজ্জিত। তুমি আপাতত এ জিহাদে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাক। তখন আবু তালহা (রাঃ) সুরা আবাসা এ আয়াত তেলাওয়াত করে ছেলেদেও শুনান। " যখন কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে, এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা, তাহার পত্নী ও তাহার সন্তান হইতে।" সুরা আবাসা:- ৩৩-৩৬ নং আয়াত। ছেলেরা অশ্রুসিক্ত হয়ে বৃদ্ধ পিতাকে সাথে নিয়ে সমুদ্রপথে জিহাদের জন্য রওনা হন। সমুদ্রপথে ঝড় হাওয়ায় অবশেষে মারা যান। আব্বা মনে রাখবেন সাহাবীগণ শহীদের ভাই, শহীদের পিতা, শহীদের মাতা, শহীদের স্বামী, শহীদের স্ত্রী হবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, এবং শহীদী মৃত্যর সংবাদে বিলাপ করে না কেঁদে বরং আল্লাহর শোকর গুজারী করে শোকরানা সেজদা আদায় করতেন। আশা করি আপনি আমার ফাঁসির সংবাদে শহীদের পিতা হবার জন্য সুরা আল ইমরানের ২০০নং আয়াত তেলাওয়াত করে শোকরানা সেজদায় আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাতের দরবারে পৌঁছিয়ে দেন এ দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ। তাহলে আমার আত্মা শান্তিতে থাকবে এবং রাসূলের (সাঃ) ওয়াদা মোতাবেক আপনাদের সাথে জান্নাতে চলে যাবো। আমিন। তাই চিরস্থায়ী সুখের জন্য ঈমানের উপর অটল থেকে সবুর করুন। বেশী বেশী ইবাদত ও তাসবীহ তাহলীল আদায় করুন। আল্লাহ বলেন:- " তিনি কাহাকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।" সুরা কাহাফ:- ২৬ নং আয়াত। " আল্লাহ যাহা অবর্তীণ করিয়াছেন তদানুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফের।" সুরা মায়িদাহ:- ৪৪ নং আয়াত, সুরা নিসার ৬০–৬৫, নং আয়াত সুরা মায়িদাহ ৪৮-৪৯ নং আয়াত, সুরা নাহলের ৩৬ নং আয়াত পড়ুন।

ভাই আপনি একজন আলেম আমি যখন কোরআন হাদীসের কথা বলছিলাম তখন আমি আপনার মধ্যে বিরক্তির ছাপ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আলেম হিসেবে এটা হওয়া মোটেই ঠিক না। আহবান থাকলো সঠিক হলে আমল করে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভ করুন। আপনাদের প্রস্তাব এজন্য প্রত্যাখ্যান করেছি, ইহা গ্রহণ করলে আল্লাহর সাথে শিরক করা হবে। আমার রায়ের ব্যাপারে কানা পয়সাও কোন উপকারে আসবে না। তাগুতের চরিত্র ও আইন বিষয়ে আমি বাস্তব ভুক্তভোগী । আল্লাহর ভয়ংকর ঘোষণার কারণে আমি তাগুত সরকারের কাছে আপিল করি নাই। আল্লাহ বলেন:- " যাহারা কুফরী করিয়াছে, কেয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য পণ স্বরূপ দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে যদি তাহাদের তাহার সমস্তই থাকে এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আয় থাকে, তবুও তাহাদের নিকট হইতে তাহা গৃহীত হবে না এবং তাহাদের জন্য মর্মস্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।" সুরা মায়িদাহ:- ৩৬ নং আয়াত। আব্বা, আম্মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন আপনারা সকলেই আপিল করার পরামর্শ দিয়েছেন, আমি ভাল করে জানি ইহাতে আমার দুনিয়াতেও কোন উপকারে আসবে না, পরন্তু আখেরাতকে আমি ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাই না। আপনাদের বলতে চাই ফাহিমার ব্যাপারে সকল কর্তৃপক্ষ বলেছে ফাহিমার কোন দোষ নেই, শুধু তার নিরাপত্তার জন্য আপাতত জেলে আটক রাখা হয়েছে। অতিসত্ত্বর তাদের ছেড়ে দেয়া হবে। আল্লাহই ভাল জানেন তাদের এ কথায় কি মতলব আছে। আমি দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছি সে আমার সংগঠনের কোন কিছুর সাথে জড়িত নয় এবং আমার এ কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ সাদ ও ফাহিমার হেফাজত করুন। আমিন। আল্লাহ বলেন:- "আল্লাহই তো আমার রব এবং তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা তাহার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ। অতপর উহাদের বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করিল, সুতরাং জালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মস্তুদ দিবসের শাস্তির। উহারা তো উহাদের অজ্ঞাতসারে

আকস্মিকভাবে কেয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করতেছে। বন্ধুরা, সেইদিন হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকী ব্যতীত। হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না। যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসর্ম্পণ করেছিল তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মীনীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।" সুরা যুখরফ ৬৪-৭০ নং আয়াত। জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে এ সুরার ৭১-৮০ নং আয়াত পর্যন্ত পড়ুন। আমি দুনিয়ার কষ্টের ও শাস্তির বিনিময়ে আখেরাতে নাজাত ও মুক্তি পেতে চাই। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন।

আব্বা নিশ্চয়ই মনে রাখবেন, তাগুতের আইনে আমি অপরাধী হলেও কোরআন ও সুন্নাহর ভাষায় আমার অপরাধ হলো " উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল মহাপরাক্রমশালী ও মহা প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি" সুরা বুরুজঃ- ৮ নং আয়াত। মুমিনগণ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জানমালের ক্ষতি, জেল, জুলম, নির্যাতন ও ফাঁসীকে হাসিমুখে বরণ করতে পারেন। কেননা আল্লাহর ঘোষণাঃ- " সুতরাং যাহারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাহারা আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করুক এবং কেউ আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র যুদ্ধ করিবে, সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী হউক আমি তাহাকে মহা পুরস্কার দান করবই। সুরা নিসাঃ- ৭৪ নং আয়াত। আমি মনে করি তাগুতের কোর্টে আপিল না করাতে আপনি দুঃখ বা মনে কষ্ট না নিয়ে বরং সবর করুন। বেশী বেশী আল্লাহর ইবাদত করুন ও সেজদায় পড়ে আমাকে আল্লাহ যেন শহীদ হিসেবে কবুল করেন ইনশাল্লাহ দোয়া করুন। মজলুমের দোয়া সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ- তিন ব্যক্তির প্রার্থনা আগ্রাহ্য হয় না। (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ। (২) রোজাদার ব্যক্তি যে পর্যন্ত না সে ইফতার করে। এবং (৩) অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার মর্যাদা উচ্চ করিবেন। অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদোয়ার কারণে আকাশসমূহের দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং আল্লাহতায়ালা বলবেনঃ- আমার সম্মান ও মর্যাদার শপথ! বিলম্বে হলেও আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো। (মুসনাদ-ই-আহমাদ), (জামেউত তিরমিযী), (সুনান-ই-নাসায়ী), (ইবনে মাযাহ)। পিতা হিসেবে রোজাদার হয়ে মজলুম হয়ে জালিমের জুলম হতে আল্লাহ ফাহিমা, সাদসহ সকল ভাই- নারী, শিশুদেরকে হেফাজত করুন এ দোয়া করুন। আমিন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ- আমার উম্মতের মধ্যে দুইটি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দিয়েছেন। (১) যারা ভারত উপমহাদেশে দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করবে। (পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ভারত উপমহাদেশের মধ্যে গণ্য)। (২) আর যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এর সাথে সম্মিলিতভাবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করবে।

আব্বা অমি বলতে চাইঃ

"মুসলিম হলো বীরের জাতি, শির সদা করে উচুঁ,
ফাঁসিতে হাসে তাঁরা, এক আল্লাহ ছাড়া তাগুতের কাছে কভু করে না মাথা নীচু।
তোরা চাসনে কিছু রবের মদদ ছাড়া, পরের উপর ভরসা ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।"

আল্লাহ বলেনঃ "হে আসমান সমূহের ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। আপনি আমার কার্যনির্বাহক দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও, আমাকে পুর্ণ আনুগত্যের অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে বিশিষ্ট নেক বান্দাগণের অন্ত ভক্ত করুন।" (সূরা ইউসুফ- ১০১)। আব্বা আপনার জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করে আমি খুব তৃপ্তি পাই। আর ফাহিমা, সাদের বাঁচার ব্যাপারে বিষন্ন ও হতাশ না হয়ে তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ আশার আলো দেখতে পাই। ফাহিমা, সাদ, বাবার হেফাজতের দায়িত্ব মহান আল্লাহর উপর ন্যস্ত করলাম। হে আল্লাহ তুমি তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমিন। হে আল্লাহ আপনি মাকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন এবং পরিবার ও আত্মীয় স্বজনকে হেদায়েতের বুঝ দান করুন। আমিন।

দাওয়াত নামা

'মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া মাদরাসা মসজিদ কমপ্লেক্স' এ আগামী ১৪ই এপ্রিল (পহেলা বৈশাখ) রোজ রবিবার সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৬ টা পর্যন্ত দিনব্যাপী এক 'তারবিয়াতী ও ইসলাহী মজলিশ' অনুষ্ঠিত হবে। সকল দায়ী ভাইদের অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল।

মুসলিম উম্মাহ’র পতনের কারণ ও প্রতিকার

মুফতী হারুনুর রশীদ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

দ্বিতীয় কারণ :

আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দেয়া :

কুরআন-সুন্নাহ,বাস্তব ইতিহাস ও দর্শন মোতাবেক ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ সর্বগ্রাসী পতন ও চরম অসহায়ত্বের কবলে পড়ার নেপথ্যে যে বিশেষ ও মৌলিক কারণ বিদ্যমান,তন্মধ্যে জিহাদ পরিত্যাগ ও ইসলামী খেলাফতের অনুপস্থিতি বৃহত্তম । জিহাদ ত্যাগ সর্বগ্রাসী পতন ও সর্বনাশা ধ্বংসের বৃহত্তম কারণ এর দালায়েল নিম্নরূপ–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য । যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না । আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান । (সুরা তাওবা- ৩৮,৩৯)

অত্র আয়াতদ্বয় নাজিল হয়েছে তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে । সকল সাহাবাই জিহাদ প্রেমিক মুজাহিদ ছিলেন । নন মুজাহিদ এক জন মাত্র সাহাবী মেলাও দুস্কর । কারণ জিহাদ ছিল তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও প্রিয়তম পেশা । কিন্তু তাবুক অভিযান কালে প্রচন্ড গরম ও পথের দুরত্ব হেতু মাত্র তিন জন সাহাবী গড়িমশি করে ঘরে থেকে যান, যারা রসূলের সাথে অপরাপর অভিযানে নিয়মিত শরিক হতেন । কিন্তু তাবুক যুদ্বে শরীক হতে রসূলের আম নির্দেশ উপেক্ষা করে এই একটি মাত্র অভিযানে শরীক না হওয়ায় আল্লাহ পীড়াদায়ক শস্তি দেয়ার এবং ইসলামের সাহায্যে বিকল্প কওম সৃষ্টি করার ন্যায় কঠিন হুশিয়ারি নাজিল করলেন ।

কি সেই পীড়াদায়ক শাস্তি? রসূলের জবানে শুনুন ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِثَوْبَانَ كَيْفَ أَنْتَ يَا ثَوْبَانُ إِذْ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمْ الْأُمَمُ كَتَدَاعِيكُمْ عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ يُصِيبُونَ مِنْهُ قَالَ ثَوْبَانُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا قَالَ لَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ يُلْقَى فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنُ قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّكُمْ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتُكُمْ الْقِتَالَ

‘আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, তিনি সাওবার (রা.) কে বললেন- ঐ সময় তোমার অবস্থা কেমন হবে হে সাওবান, যখন কাফের জাতিগুলো তোমাদের উপরে হামলে পড়বে যেরূপ খাদ্যের বড় পাত্রের উপরে তোমরা ডাকাডাকি করে জড়ো হও? আমি বললাম সেদিন কি আমাদের সংখ্যা সল্পতা হেতু এরূপ হবে? রসুল বললেন বরং সেদিন তোমরা সংখ্যায় (বর্তমানের তুলনায়) বেশি হবে । তবে দুর্বলতা তোমাদের কে পেয়ে বসবে । আমি বললাম দুর্বলতা কি? বললেন দুনিয়ার মহব্বত ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করাকে অপছন্দ করা । (মুসনাদে আহমাদ-৮৭১৩ সনদ সহীহ)

নি;সন্দেহে আজকের ইসলামও মুসলিম উম্মাহের বিপর্যয় ও উহার কারণ অত্র হাদীসের নিখুত চিত্র । ইয়াহুদী নাসারা হিন্দু-বৌদ্ধ ও কমুনিষ্ট এ সকল কাফির জাতি এক যোগে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের উপরে হামলে পড়েছে । কারণ তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে কাফিরদের জন্য আগ্রাসনের পথ নিষ্কন্টক করে রেখেছে ।

যথা আমাদের ভারত উপমহাদেশে দ্বীনদার হিসেবে পরিচিত মহল চার ভাগে বিভক্ত । উলামায়ে দেওবন্দ তাবলীগ জামাত, কথিত ইসলামী রাজনৈতিক দল সমূহ ও ও কথিত হক্কানীপীর মুরীদের জামাত । এই চার ভাগের কোন ভাগ আল্লাহর পথে যুদ্ধ কে নিজেদের কর্মসূচীতে স্থান দিয়েছেন কি? নিশ্চয় না । উলামায়ে দেওবন্দ এর ক্ষুদ্র একটি অংশ বাদে বাকীরা জিহাদ ছেড়ে রাম শাসন-বাম শাসন মেনে নিয়েছেন । তাবলীগ জামাত মাহদী (সা:)এর আবির্ভাব পর্যন্ত জিহাদ মওকুফ ঘোষনা করেছেন । তথাকথিত ইসলামী রাজনীতিকরা গনতান্ত্রিক আন্দোলন ও নির্বাচন কে আল্লাহর পথে যুদ্ধের বিকল্প সাব্যস্ত করেছেন । আর সুফীদের শরীয়াতে তো আল্লাহর পথে যুদ্ধের কোন বিধানই নেই । এমতাবস্থায় ভারত ও আরাকানে ইসলাম ও মুসলিমদের উপরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে বাঁধা কোথায়? অচিরেই হাজার হাজার খৃষ্টান এনজিও বাংলাদেশ গিলে ফেলতে সমস্যা কোথায়?

পরিশেষে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কে অপছন্দ করার গোপন রহস্য চিহ্নিত করতেও আল্লাহর রসুল (সা.) ভুল করেননি । গোপন রহস্যটি হলো দুনিয়ার ভালবাসা । কারণ ইসলামের যাবতীয় আহকামের মধ্যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করাই একমাত্র আমল, যা বাস্তবায়নের পথে পা রাখতে গেলে জীবনের নিরাপত্তা, যাবতীয় আরাম- আয়েশ ও ভোগ বিলাস হতে হাত

ঝেড়ে রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী হতে হয়।
তাই দুনিয়াভক্তের জন্য দ্বীনের সব আমল সম্ভব হলেও মুজাহিদ বনা সম্ভব হয় না। জিহাদ তাদেরই আমল যারা দুনিয়ার জীবন কে আখেরাতের বদলায় বিক্রয় করে দেয়। যথা–

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحيوة بالاخرة

'আল্লাহর পথে যেনো তারাই লড়াই করে যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বদলায় বিক্রি করে দেয়।' (সুরা নিসা, ৭৪)
একারণেই রসূল (সা.)এর যুগে মুনাফিক ও মুমিন চেনার প্রধান উপায় ছিল জিহাদ। মুনাফিক চক্র জিহাদ ছাড়া অপর আমল সমুহে সাহাবাদের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদেরকে গোপন করতে পারলেও জিহাদের ডাক পড়লে তারা থলের বিড়াল বের না করে পারত না। তাদের এই কীর্তির বয়ান আল্লাহ সুরা আল-ইমরান, আনফাল, তাওবা, মুহাম্মদ, ফাতাহ ইত্যাদি সুরায় দীর্ঘ পরিসরে দান করেছেন। ঐ সকল সুরায় মুনাফিকদের পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরামের বেনজীর জিহাদ প্রেমের বয়ান ও সবিস্তারে পেশ করেছেন। সুতরাং মুসলিম উম্মাহ রসূল (সা.) ও সাহাবাদের জিহাদী পথ ছেড়ে মুনাফিকদের পিছে চলা শুরু করলে কুফুরী শক্তি কর্তৃক সর্বগ্রাসী লাঞ্ছনা ও বিপর্যয় তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। যার দলীল উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস। কুরআন সুন্নাহে এ মহা সত্যের আরো বহু দলীল বর্তমান। যথা বনী ইসরাঈল যুগে আগ্রাসী কাফির জালুত বাহিনীকে মুমিন মুজাহিদ তালুত বাহিনীর হাতে পরাস্ত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ

আর যদি আল্লাহ কতক মানুষকে কতক মানুষের মাধ্যমে (অর্থাৎ কুফুরীচক্র কে মুমিনদের মাধ্যমে) প্রতিহত না করতেন তবে অবশ্যই দুনিয়া বরবাদ হয়ে যেত। (বাকারা-২৫১)

অত্র আয়াতে দুনিয়া বরবাদ হওয়া মানে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ ধ্বংস হওয়া। যথা মদীনায় হিজরত বাদ সাহাবাদের কে জিহাদের অনুমতি দেয়ার অপরিহার্যতা ব্যক্ত করতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

'যদি আল্লাহ মানুষের কতক কে কতকের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন তবে (প্রাচীন তাওহীদবাদি) ইয়াহুদি

> 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।
> যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (সুরা তাওবা-৩৮,৩৯)

নাসারাদের ইবাদতগাহ ও মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত করা হত, যার মধ্যে বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা হয়। (সুরা হজ্জ-৪০)
অত্র আয়াত সুস্পষ্ট করলো যে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদসহ হাজারো মসজিদ কুফুরী আগ্রাসনে বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ কি এবং উহা হেফাজতের পথ কি।
রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

'ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি যখন তোমরা ঈনা (এক ধরনের সুদী কারবার) বেচাকেনা করবে এবং (চাষের জন্য) গরুর লেজ অনুসরণপূর্বক কৃষক বনে তৃপ্ত হয়ে যাবে। ফলে জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপরে লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন যা তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে আসা পর্যন্ত দূর করবেন না।' (আবু দাউদ: ৩৪৬৪)

জিহাদ ত্যাগ করা মানে আল্লাহর সাথে চরম গাদ্দারি (বিশ্বাসঘাতকতা) করা :

সূরা তওবার পূর্বোক্ত ৩৯ আয়াতে আল্লাহ জিহাদ ত্যাগের দুটি পরিণাম উল্লেখ করেছেন। একটি কঠিন শাস্তি দেয়া। অপরটি ইসলামের প্রতিরক্ষায় জিহাদত্যাগীদের মোকাবেলায় ভিন্ন কওম সৃষ্টি করা। ইসলামের অপর কোনো মহা ফরজ আমল ত্যাগে এহেন ভয়ানক ও চরম বঞ্চনামূলক পরিণতি কুরআন সুন্নাহের কোথাও ঘোষিত হয়নি। ঘোষিত হল একমাত্র জিহাদ ত্যাগের বেলায়। এর অন্তর্নিহিত কারণটি কি? কারণ হলো সালাত ত্যাগ, সিয়াম ত্যাগ, যাকাত ত্যাগ, হজ্জ ত্যাগ বা অপর কোনো ফরজ ত্যাগ এবং জিহাদ ত্যাগ এক কথা না। এ সকল আমলই ফরজ এবং উহার কোনো একটি ছেড়ে দেয়া কবীরা গোনাহ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও জিহাদ ত্যাগ এবং অপর কোনো ফরজ ত্যাগের মাঝে রয়েছে আসমান জমীন তফাৎ। কারণ জিহাদ ব্যতীত অপর কোনো ফরজ আমল ছাড়লে আল্লাহর সৃষ্ট সমগ্র পৃথিবী এবং তার রচিত প্রিয়তম ইসলামী শরীয়াত ধ্বংসের জন্য তার শত্রু পক্ষের হাতে তুলে দেয়া হয় না। পক্ষান্তরে জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমে এ কীর্তিটাই করা হয়।

এ সংক্ষেপ কথার ব্যাখ্যা হল– আল্লাহ শুধু ইলাহ বা মাবূদ এবং রব বা প্রতিপালকই নন। বরং এর পাশাপাশি তিনি মালিক তথা সার্বভৌম বাদশাহ, রাজা ও শাসক। যথা–

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ

'তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোনো (সত্য) মাবুদ নেই। যিনি সার্বভৌম বাদশা।' (সুরা হাশর-২৩)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ – مَلِكِ النَّاسِ

'আপনি বলুন আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের বাদশাহের।' (সুরা নাস: ১-২)

আল্লাহর এ বাদশাহিত্ব সাত আসমান সাত জমীন সহ তামাম মাখলূকের উপরে প্রযোজ্য। কারণ সৃষ্টি যার শান তার। এটি নিতান্তই সঙ্গত দাবি। যথা– أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ শুনে রাখ সৃষ্টি তারই। (তাই) শাসন তারই। (সুরা আরাফ-৫৪)

এই হিসেবে একমাত্র আল্লাহই সার্বভৌম রাজা এবং কুল মাখলুকাত তার প্রজা। বাদশাহর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহর মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান। যথা- যে কোনো রাজার শাসন ও হুকুম প্রয়োগের জন্য তার প্রজাদের মধ্য হতে তার একান্ত অনুগত বিশেষ বাহিনী প্রস্তুত থাকে, যারা রাজার হুকুম নিজেদেরও সকল প্রজাদের উপরে প্রয়োগ করে। আল্লাহর শাসন ও হুকুম তার সকল মাখলূকের উপরে প্রয়োগের জন্য এমন বিশেষ বাহিনী নিয়োজিত রয়েছে। তারা হলেন মালায়িকা বা ফেরেশতাকুল। কারণ কুরআন সুন্নাহের প্রচুর ভাষ্য মোতাবেক অন্য সকল মাখলুকের নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান, প্রতিপালন, শাসন, জীবন, মরণ ও শাস্তি প্রয়োগে আল্লাহ সমগ্র আসমান জমীনে ফেরেশতাকুলকেই হাতিয়ার হিসেবে অসংখ্য দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। অত:পর কবর-হাশর ও জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ন্ত্রণেও এরা আল্লাহর শাহী ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এমনিভাবে দুনিয়ার কোনো রাজবাহিনী যেমন বিশেষ দুটি বৈশিষ্ট্য তথা রাজার আনুগত্য ও প্রজাদের উপরে রাজার শাসন প্রয়োগে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয়, আল্লাহর শাহী ফোর্স মালায়িকা ও তদ্রুপ। যথা–

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

'জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে কঠোর প্রচন্ড ক্ষমতাধর ফেরেশতাকুল। যারা অমান্য করেনা আল্লাহর নির্দেশ, বাস্তবায়ন করে তার আদেশ। (সুরা তাহরীম, ৬৬:৬)

দুনিয়ার রাজবাহিনী যেমন প্রধান কমান্ডারের অধীনে সংগঠিত থাকে, মালায়িকাও তদ্রুপ। যথা জিবরাইল (আ.) সকল ফেরেশতার প্রধান কমান্ডার। ইসরাফীল, মিকাইল ও মালাকুল মাওত বিশেষ কমান্ডার। মালিক ফেরেশতা জাহান্নাম রক্ষীদের এবং রেদওয়ান ফেরেশতা জান্নাত নিয়ন্ত্রকদের গ্রুপ কমান্ডার।

কুরআন-সুন্নাহের দলীল সমৃদ্ধ এ সকল তথ্য এ সত্যের মহা প্রমাণ যে বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহ সকল মাখলূকের বাদশা, রাজা ও শাসক।

অত:পর জানা আবশ্যক যে আল্লাহর হুকুম ও আইনের শাসন প্রয়োগের দায়িত্ব যেমন ফেরেশতাকুলের উপরে অর্পিত, তেমনি উহা মানুষের দায়িত্বেও অর্পিত। মানুষ আল্লাহর নির্দেশক্রমে তার সকল আহকাম ও আইনের শাসন প্রয়োগে দায়বদ্ধ, তার নাম ইসলামি শরীয়াত। মাটির দুনিয়ায় মানবজাতির উপরে আল্লাহ তার রচিত ইসলামি শরীয়াতের শাসন প্রয়োগ ফরজ করেছেন। যাতে বাস্তব আমলে প্রমাণিত হয় যে কারা আল্লাহর সার্বভৌম বাদশাহিত্ব মেনে নিয়ে তার আইনের অনুগত হয় এবং কারা তার বাদশাহিত্ব ও শাসনাধিকার প্রত্যাখ্যান করে তার অবাধ্য ও বিদ্রোহী বনে যায়। দুনিয়ার কুফুরি চক্র এ পরীক্ষায় ফেল করলো। তারা শয়তান পক্ষে যোগ দিয়ে তাগুতের শাসনাধিকার মেনে নিলো এবং আল্লাহর শাসনাধিকার প্রত্যাখ্যান পূর্বক তার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। এখন তাদের জীবন সাধনা ও প্রিয়তম মিশন ধার্য হলো যে কোনো মূল্যে মানব জীবনের সর্বস্তর হতে আল্লাহর আইনের আনুগত্য ও শাসন বিলুপ্ত করে তাগূতি জীবন ব্যবস্থা চালু করা। এর বাস্তবায়ন তাদের জীবনের পরম আকাংখা। যথা–

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَــرُوا فَتَكُونُــونَ سَوَاءً

'তাদের আকাংখা যদি তোমরা কাফির বনতে যেমন তারা বনেছে, ফলে তোমরা একাকার হয়ে যেতে। (সুরা নিসা-৮৯)

অত:পর আকাঙ্খা পর্যন্তই শেষ না। বরং এ আকাঙ্খাকে বাস্তবতার জামা পরাতে তাদের তাবৎ বিবেকবুদ্ধি শক্তিসামর্থ কৌশল-ষড়যন্ত্র ও বিরামহীন চেষ্টা-সাধনা নিয়োগ করা সহ, পোড়ামাটির যুদ্ধনীতি গ্রহণ করলো। তাহলো আল্লাহর শরীয়াত ও উহার অনুগতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে হবে যতক্ষণ না তারা সর্বাত্মক কাফের হয়ে তাগুতের দলভুক্ত হয় অথবা মৃত্যুকে গ্রহণ করে তাগুতি রাজত্বের জন্য দুনিয়া খালি করে দেয়। যথা–

لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَــرُدُّوكُمْ عَــنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

কাফির চক্র সামর্থ সাপেক্ষে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তেই থাকবে তোমাদেরকে কাফির বানানো পর্যন্ত। (বাকারা-২১৭)

এ ভাবে বাদশাহিত্বের আরো একটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহর বেলায় পূর্ণতা লাভ

'ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি যখন তোমরা ঈনা (এক ধরনের সুদী কারবার) বেচাকেনা করবে এবং (চাষের জন্য) গরুর লেজ অনুসরণপূর্বক কৃষক বনে তৃপ্ত হয়ে যাবে। ফলে জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপরে লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন যা তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে আসা পর্যন্ত দূর করবেন না।' (আবু দাউদ: ৩৪৬৪)

করলো। তা হচ্ছে যে কোনো বাদশাহের শত্রুবাহিনী বর্তমান থাকা। তবে মানবজাতির একটি অংশ আল্লাহর অনুগত থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। তারা হলো মুমিন সম্প্রদায়। এবার আল্লাহর আনুগত্যের দাবিতে তাদের কে নিষ্ঠাবান কে কপট এবং নিষ্ঠাবান হলে কে কোন স্তরের অধিকারী, তার পরীক্ষা নেয়ার জন্য আল্লাহ মুমিনদের উপরে ফরজ করলেন আল্লাহর শাসন রক্ষায় বিদ্রোহী শয়তান চক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যথা–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

'তোমাদের উপরে যুদ্ধ ফরজ করা হলো।' (বাকারা-২১৬)

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

'যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।' (সুরা নিসা-৭৬)

এ ধরণের যুদ্ধ নির্দেশক আরো বহু আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের কে দুনিয়ায় তার শাসন প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিরক্ষী সেনাবাহিনী নিয়োগ দান করেছেন। অত:পর প্রচুর আয়াত নাযিল করে বিদ্রোহী তাগূতী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ার সহায়ক যাবতীয় নির্দেশনা দান করেছেন। শত্রুর উপরে জয়ী হওয়ার সকল উপায় বিশ্লেষণ করেছেন। সেই মোতাবেক যুদ্ধে নামলে আমাদেরকে তার গায়েবী সাহায্য ও বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন। অত:পর তার পথে যুদ্ধ ও বিজয়ের অনিবার্য প্রাপ্তি হিসেবে দুনিয়ায় শান্তি-নিরাপত্তা ও ইজ্জত-সফলতার শীর্ষ আসন ইসলামি খেলাফত এবং আখিরাতে জাহান্নাম হতে মুক্তি ও উচ্চতর জান্নাত দানের নিশ্চিত ওয়াদা করেছেন। এ সব কিছু সত্ত্বেও তাগূতবাহিনীর সর্বনাশা হামলার প্রতিরোধ না করে তথাকথিত মুমিনবাহিনী হাত গুটিয়ে বসে থাকা আল্লাহর সাথে কোন পর্যায়ের গাদ্দারি তা চিন্তা করে দেখুন।

কারণ সালাত-সিয়াম ইত্যাদি ত্যাগের ক্ষতি ব্যক্তির উপরে সীমাবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর সেই দ্বীনকে হত্যার জন্য শত্রুর হাতে তুলে দেয়া হয়, যার তরে শহীদ হয়েছেন আল্লাহর প্রিয়তম অসংখ্য নবী-রাসূল ও প্রথম সারির মুমিনগণ। জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর অবতারিত সেই কুরআন সুন্নাহকে বাস্তবায়নহীন কাগুঁজে শরীয়াতে পরিণত করা হয়, যার বহন ও সংরক্ষণে উহার অগণিত ইমাম ও বাহক জীবনপাত করে গেছেন। জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্ট দুনিয়াকে তার বিদ্রোহী দুশমনদের জন্য স্বর্গরাজ্য ও তার অনুগতদের জন্য নরকে পরিণত করা হয়। জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর একান্ত ঘর অসংখ্য মসজিদকে গুড়িয়ে দিতে উহাকে নাপাক কাফিরদের সেনা ক্যাম্প, মদশালা ও টয়লেট বানানোর সুযোগ দেয়া হয়। জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমে তাগুতকে ক্ষমতায় বসিয়ে তার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ পাপাচারের সয়লাব চালিয়ে দেয়া হয়, যা তাদের ঈমান ও দ্বীন হরণ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে, জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমে লাখো খাদীজা, আয়েশা ও ফাতেমাকে কাফির নামক হিংস্র পশুদের যৌনদাসী বানানো হয়। জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমে অসংখ্য গর্ভবতী মুসলিম নারীদের পেট ফেড়ে মুসলিম নবজাতককে মায়ের সামনে টুকরো টুকরো করার সনদ প্রদান করা হয়। জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমে এইতো মগের মুল্লুক আরাকানে ইসলামের প্রতীক উলামাদের দাড়ি কামিয়ে শুকর বহনে বাধ্য করা হয়। জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমে লাওহে মাহফুজ হতে অসংখ্য ফেরেশতার প্রহরায় অবতারিত আল্লাহর কিতাবকে ডাষ্টবিন ও টয়লেটে নিক্ষেপ করার লাইসেন্স দেয়া হয়। জিহাদ ত্যাগের মাধ্যমেই রাসুলের (সা.) ব্যঙ্গ ছবি আঁকতে এবং কালিমায়ে তায়্যিবা লিখিত বল ও স্যান্ডেল উৎপাদনের সাহস দান করা হয়।জিহাদ করতে সক্ষম মুসলিম পুরুষেরা যখন আল্লাহর অজস্র নেয়ামতের নেমকহারামি করে তার ফরজকৃত জিহাদ ছেড়ে আল্লাহর দ্বীন-দুনিয়া ও অবলা নারী শিশুদেরকে উক্তরূপে ধ্বংস করতে আল্লাহর দুশমনদের হাতে তুলে দেয়, তখন ইনসাফের বিচারে তাদের শাস্তি কঠিন হওয়া এবং আল্লাহর আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে মিল্লাত ও উম্মাতের প্রতিরক্ষা বাহিনী হতে বরখাস্ত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ সেই ফয়সালাই ঘোষণা করেছেন–

> 'যদি তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং (দ্বীনের সাহায্যে) তোমাদের বদলায় অপর কওম আনয়ন করবেন। তোমরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। কারণ আল্লাহ সব কিছুতেই সক্ষম।' (সুরা তাওবা-৩৯)

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'যদি তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং (দ্বীনের সাহায্যে) তোমাদের বদলায় অপর কওম আনয়ন করবেন। তোমরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। কারণ আল্লাহ সব কিছুতেই সক্ষম।' (সুরা তাওবা-৩৯) উপরোক্ত বিশ্লেষণে স্পষ্ট হল বিশ্ব কুফুরি শক্তি কর্তৃক ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের সর্বগ্রাসী পতন আগ্রাসন ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে জিহাদ ত্যাগের নজীরবিহীন ভূমিকা। আরো বুঝা গেলো পাপ হিসেবে জিহাদ ত্যাগের বৃহত্তমতা এবং আল্লাহ রসুল মিল্লাত ও উম্মাতের সাথে যারপর নেই বিশ্বাসঘাতকতা। এ কারণে সুরা মায়েদার ২৫-২৬ নম্বর আয়াতে এবং সুরা তাওবার ২৪ নম্বর আয়াতে জিহাদ ত্যগীদেরকে ফাসিক তথা আল্লাহর চরম অবাধ্য আখ্যায়িত করেছেন। আর জিহাদ ত্যাগকে অসংখ্য আয়াতে একমাত্র প্রতারক বিশ্বাস ঘাতক ধূর্ত মুনাফিকদের চরিত্র চিহ্নিত করেছেন।

শীর্ষ সংবাদ

১-৩-১৩ শুক্রবার

● নাস্তিক, চরম ইসলাম বিদ্বেষী, মদ্যপ, বেয়াদব, তথাকথিত ব্লগার রাজীব হায়দার ওরফে থাবা বাবা হত্যার অভিযোগে নর্থ সাউথ বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাঁচ মেধাবী ছাত্রকে গ্রেফতার। রাসূলের দুশমন, মুরতাদ থাবা বাবা হত্যার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত পাঁচ ছাত্রকে জাতির বীর সন্তান খেতাব দিয়ে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য জোর দাবী জানানো হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে।

● বাংলাদেশের মসজিদগুলোতে কঠোর পুলিশি বেষ্টনি এবং গোয়েন্দা নজরদারিতে জুমুআর সালাত আদায়।

● ক্ষমতাসীন আওয়ামীলিগের পূর্ণ সমর্থণ, সহযোগীতা ও অংশগ্রহণ সত্ত্বেও শাহবাগে নাস্তিকদের মহা সমাবেশে বিস্ময়করভাবে ফ্লপ। লোক সামগম একেবারেই কম।

● সৌদি আরবে আল কায়েদার বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ করায় ১৫ নারীসহ ১৭৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির পুলিশ।

● ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম উপকূলে কাঠের নৌকা থেকে ২৩ শিশুসহ মিয়ানমারের ৬৩ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করা হয়েছে। 'উদ্ধার করা মানুষগুলো মিয়ানমার থেকে এসেছে। উদ্ধার করা মানুষগুলো ক্লান্ত। কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে।' রোহিঙ্গাদের ওই দল জানায়, থাইল্যান্ডের জলসীমা অতিক্রমের সময় তাদের খাদ্য ও পেট্রল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। জাতিসংঘের বিবেচনায় রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রহীন সংখ্যালঘু মুসলমান। আর মিয়ানমার মনে করে, রোহিঙ্গারা অবৈধ বাংলাদেশি। আর ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, তারাই ঐ দেশের প্রাচীন আদিবাসী।

● আফগানিস্তানে রাস্তার পাশে বোমা পুতে রেখে আট জন পুলিশকে হত্যা করে মুজাহিদীনরা।

২-৩-১৩ শনিবার

● দেশজুড়ে সংঘর্ষে কমপক্ষে সাত জন নিহত। নিরাপত্তা বাহিনীর সরাসরি গুলিতে বেশীরভাগ লোক নিহত হয়েছে বলে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বিবৃতি।

● কক্সবাজারে বাংলাদেশের সীমান্ত আতিক্রম করে মোস্তাক আহমদ নামে এক বাংলাদেশী জেলেকে বেদম প্রহার করেছে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকা। সীমান্তে বিজিবির টহল তৎপরতা কমে যাওয়ায় অভিযোগ সীমান্তের অধিবাসীদের।

● রাজশাহীতে 'আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী তাবলিগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত। নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তির দাবী।

৩-৩-১৩ রবিবার

● দেশজুড়ে রক্তের হোলী খেলা। পুলিশের সরাসরি গুলিতে কমপক্ষে ২৭ জন নিহত।

● অব্যাহতভাবে গণহত্যা চলা অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির বাংলাদেশ সফর।

৪-৩-১৩ সোমবার

● পুলিশ ও বিজিবির গুলিতে সারাদেশে ৬ জন নিহত।

● মালিতে তীব্র সংঘর্ষে মুজাহিদীনদের হাতে কমপক্ষে ৩০ জন ফরাসী সেনা নিহত।

● তথাকথিত সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৯৪ জন মুসলিম মুজাহিদের বিরুদ্ধে বিচার শুরু।

● ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলীয় আনবার প্রদেশে গাড়িবহরে আল কায়েদার বন্দুকধারীদের হামলায় ৪০ জন সিরিয়ান সেনাসদস্য নিহত হয়েছে। এছাড়া হামলায় বহরে থাকা অপর আট ইরাকি সেনাসদস্যও নিহত হয়েছে।

৫-৫-১৩ মঙ্গলবার

● বগুড়ার শেরপুরে যুব-লীগের নেতৃত্বে শহীদ মিনার ভাঙার সময় এলাকাবাসী যুবলীগ নেতা তবিবুর রহমান টিপুকে হাতেনাতে পাকড়াও করে।

● সিরিয়ার বিদ্রোহীরা দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় রাকা প্রদেশের গভর্নরকে আটক করেছে। বিদ্রোহীদের একটি অ্যামেচার ভিডিও ফুটেজে হাসান জলিলি নামের ওই গভর্নরকে আটকের দৃশ্যও প্রচার করা হয়। রাকায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিদ্রোহীদের সঙ্গে আল-নুসরা জিহাদি ফ্রন্টের অসংখ্য মুজাহিদরা যুদ্ধ করছেন।

৬-৩-১৩ বুধবার

● সিরিয়ান বিদ্রোহীদের হাতে জাতিসংঘের তথাকথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর ২১ সদস্য আটক।

৭-৩-১৩ বৃহস্পতিবার

● পুলিশ র‌্যাবের গুলিতে চাপাইনবাবগঞ্জে একজনের মৃত্যু।

● রাজধানীর পল্লবীতে রাতে চাপাতির কোপে সানিউর রহমান (২৭) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন। সে নিজেকে ব্লগার দাবি করে এবং শাহবাগের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বলে জানায়।

● পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ওরাকজাইয়ের নাদিরমেলা এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর একটি গাড়িতে দূরনিয়ন্ত্রিত বোমা হামলা চালানো হলে নিরাপত্তা বাহিনীর ১ সদস্য নিহত ও ৩ সদস্য আহত হন। পাকিস্তানের ৭টি আধা-স্বায়ত্তশাসিত আদিবাসী অঞ্চলের একটি ওরাকজাই। ওই অঞ্চলে পাকিস্তানি তালেবান ও আল কায়দার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলগুলোর শক্ত অবস্থান রয়েছে।

● ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল মিসর থেকে ইসরাইলি ভূখণ্ডে আক্রমণ চালিয়েছে। সংখ্যায় এরা কোটি কোটি। পঙ্গপালের আক্রমণে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত এই রাষ্ট্রটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

৮-৩-১৩ শুক্রবার

● রণপ্রস্তুতি নেয়া ব্যাপক সংখ্যক র‌্যাব ও পুলিশের প্রতিরোধের কারণে বায়তুল মোকাররম এলাকায় পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচি পণ্ড হয়ে যায় ঈমান ও দেশরক্ষা আন্দোলনের শানে রাসুল (সা.) সমাবেশ। বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেট বন্ধ করে অন্য গেটগুলোতে প্রবেশের সময় মুসল্লিদের দেহ ও ব্যাগপত্র তল্লাশি করা হয়। নামাজের আগে ও পরে ওই এলাকা থেকে দেড়শতাধিক মুসল্লিকে আটক করা হয়। পুলিশের ধাওয়ায় নিহত হয় একজন মুসল্লি।

● চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহীতে ইসলাম বিদ্বেষী শাহবাগি ব্লগারদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত সর্বাত্মক বিক্ষোভ মিছিল করেছে ধর্মপ্রাণ তাওহিদী জনতা। সমাবেশে বক্তারা মহানবী (সা.) কে অবমাননাকারী নাস্তিক ব্লগারদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান। অন্যথায় সারাদেশে লাগাতার হরতাল ও রাজধানী ঢাকা ঘেরাওয়ের ঘোষণা দেন তারা।

● উত্তর চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র হাটহাজারী উপজেলা সদরে বাদ জুমা হেফাজতে ইসলামের উদ্যোগে নাস্তিক

ব্লগারদের বিরুদ্ধে লক্ষাধিক জনতার বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

● আল-কায়েদার শীর্ষ নেতা ওসামা বিন লাদেনের 'মুখপাত্র' ও জামাতা সুলাইমান আবু ঘাইথকে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের ফেডারেল কোর্টে হাজির করা হয়। আবু ঘাইথ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (টুইন টাওয়ার) হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী ছিলেন বলে মার্কিন কর্মকর্তারা দাবি করেছেন। আল-কায়েদার তহবিলসহ পাকিস্তান-আফগানিস্তানে সংগঠনের মূল কাঠামোতে তাঁর প্রভাব ছিল। আবু ঘাইথ ২০০১ সালের মে মাস থেকে ২০০২ পর্যন্ত বিন লাদেনের পাশে থেকে কাজ করেছেন। তিনি আল-কায়েদার পক্ষে কথা বলতেন এবং বিশ্বব্যাপী ১১ সেপ্টেম্বরের মতো আরও হামলা চালানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন।

● দখলদার ইসরাইলি বাহিনী শুক্রবার মুসলিমদের প্রথম কেবলা আল-আকসা মসজিদে মুসল্লিদের ওপর হামলা চালায়। জুমার সালাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইলের বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মসজিদে ঢুকে মুসল্লিদের ওপর চড়াও হয়। এ সময় মুসল্লিদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট ও গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। হামলায় বেশ কয়েক জন মুসল্লি আহত হয়েছেন।

৯-৩-১৩ শনিবার

● আত্মঘাতী বোমায় আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে অন্তত ৯ জন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়। আফগানিস্তানের কেন্দ্রস্থলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাইরে বিকট শব্দে এই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর পরই চারদিক থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। তালেবান এ হামলার দায় স্বীকার করেছে। এই বিস্ফোরণের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এক আকস্মিক সফরে কাবুল ছিলেন।

● এক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ করায় পাকিস্তানের লাহোরের বাদামিবাগ এলাকার জোসেফ কলোনির বাড়িঘরে হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। হামলাকারীরা কয়েকশ' বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

১০-৩-১৩ রবিবার

● মিয়ানমারের ১৩৬ জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে উদ্ধার করেছে মালয়েশিয়া। মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় পেনাং রাজ্যের উপকূল থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। মিয়ানমারের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার এসব মানুষ একটি ভাঙা নৌকায় চড়ে পালিয়ে আসছিল। নৌকায় কোনো খাবার কিংবা পানীয় ছিল না। উদ্ধার হওয়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে ৪০টি শিশু আছে। রোহিঙ্গারা তাদের জানিয়েছে, দুর্বল ও ভাঙা কাঠের নৌকাটিতে তারা ২৫ দিন ধরে সমুদ্রে ভাসছিল। তাদের সঙ্গে থাকা খাদ্যসামগ্রীও ফুরিয়ে গিয়েছিল।

১১-৩-১৩ সোমবার

● পাকিস্তানের ওরাকজাই উপজাতীয় অঞ্চলে স্বয়ংক্রিয় বোমা হামলায় এক ক্যাপ্টেন ও দুই সেনা নিহত হয়। আহত হয় আরও দুই সেনা।

● আল কায়দার ইরাক শাখা পশ্চিম ইরাকে সৈন্যদের একটি গাড়ি বহরে হামলা চালিয়ে ৪৮ সিরীয় সৈন্য ও ৯ ইরাকি রক্ষীকে হত্যা করে।

● সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মীয় কাউন্সিল গঠন করেছে ইসলামপন্থী বিদ্রোহী আল নুসরা ফ্রন্টের সদস্যরা। আল নুসরা জানিয়েছে, তারা সিরিয়াকে একটি ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।

● আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশে একটি ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে সোমবার পাঁচ মার্কিন সদস্য নিহত হয়। অন্যদিকে সোমবার পূর্বাঞ্চলীয় ওয়ারদাক প্রদেশে মার্কিন ও আফগান সৈন্যদের সমাবেশে গুলি চালিয়ে একজন আফগান পুলিশ কর্মকর্তাসহ ৭ জনকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে ২ জন মার্কিন ও ৫ জন আফগান।

১২-৩-১৩ মঙ্গলবার

● আলেমদের প্রতিরোধের মুখে চট্টগ্রামে বুধবারের সমাবেশ স্থগিত করে শাহবাগি নাস্তিকরা। সরকারের সার্বিক মদদপুষ্ট এই উগ্রপন্থিরা প্রথমবারের মতো বড় ধরনের পরাজয় মেনে নিয়ে এই সমাবেশ স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয়।

● লোক সমাগম ছাড়াই চট্টগ্রামের প্রেসক্লাবের সামনে নাস্তিক ব্লগারদের সমাবেশ। কথিত বোমা বিস্ফোরণের নাটক।

১৩-৩-১৩ বুধবার

● ভারত ও পাকিস্তানের গোলযোগপূর্ণ কাশ্মীর সীমান্তের একটি সেনাছাউনিতে ফিদায়ী গ্রেনেড হামলা ও গুলির ঘটনায় ভারতীয় আধাসামরিক বাহিনীর পাঁচজন সদস্য নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আরও সাতজন আহত হয়েছে।

● কক্সবাজারের উখিয়া অঞ্চল থেকে তিন পুলিশসহ ৪ বাঙ্গালীকে ধরে নিয়ে যায় মিয়ানমারের সিমান্তরক্ষী নাসাকা বাহিনী।

১৪-৩-১৩ বৃহস্পতিবার

● বরিশালে সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম ও তাওহিদী জনতার সমাবেশ থেকে নাস্তিক ব্লগারদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা।

● বাগদাদে আইন মন্ত্রনালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সামনে ফিদায়ী বোমা হামলা ও গুলি বর্ষণে কমপক্ষে ১৫ জন শিয়া সরকারের কর্মকর্তা নিহত।

● চান্দিনা উপজেলার এএমএফ উচ্চ বিদ্যালয়ের জুনিয়র শিক্ষক বাবু নীহার চন্দ্র সূত্রধর মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে কটূক্তি করাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা।

১৫-৩-১৩ শুক্রবার

● বরাবরের মত পুলিশী অবরুদ্ধ অবস্থায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জুমুআর সালাত আদায়।

● জুমুআর সালাতের পর নাস্তিক ব্লগারদের বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় সমাবেশ। হাজারো মুসুল্লিদের সমাগম।

● আওয়ামী নেতাকর্মীদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে সাভারে নাস্তিক ব্লগারদের সমাবেশ। ভারি অস্ত্র-শস্ত্রসহ চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

● ৩৩টি ইসলামি সংগঠনের নেতাদের এক যৌথ বিবৃতিতে ফরিদ উদ্দিন মাসউদ এবং তার সহচরদের ওলামায়ে 'ছু' হিসেবে ঘোষণা।

১৬-৩-১৩ শনিবার

● পাকিস্তানে বাস খাদে পরে ২৩ জন সেনা সদস্যের মৃত্যু।

● ভারতের উগ্রবাদী হিন্দু মৌলবাদী দল বিজেপির ঢাকা অভিমুখে লংমার্চের ঘোষণা।

১৭-৩-১৩ রবিবার

● সিরিয়ার সেনাবাহিনী থেকে একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলসহ ২০ সেনার পক্ষ ত্যাগ।

১৮-৩-১৩ সোমবার

● দিল্লির প্রত্যক্ষ উদ্যোগেই শাহবাগ

নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে- মাওলানা আহমদুল্লাহ আশরাফ।

● পাকিস্তানের পেশোয়ারে আদালত চত্ত্বরে ফিদায়ী বোমা হামলায় ৪ জন নিহত।

১৯-৩-১৩ মঙ্গলবার

● সিলেটে ওলামা মাশায়েখদের সমাবেশ থেকে সিলেটে নাস্তিক ব্লগারদের অবাঞ্চিত ঘোষণা।

● বাগদাদের দক্ষিণে একটি শিয়া এলাকার পুলিশ ফাড়িতে গাড়ী বোমা হামলায় ৫০ জন নিহত।

২০-৩-১৩ বুধবার

● মিয়ানমারের মেইখতিলা শহরে বৌদ্ধদের হামলায় প্রায় ২০০ জন মুসলিম নিহত। শহর জুরে কারফিউ জারি করে হত্যাকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় সরকার।

● বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের মৃত্যু।

● ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে মাগুরার জগদল স্কুলশিক্ষক অশোক কুমারের কটূক্তির প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে এবং টায়ার জ্বালিয়ে দু'ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে।

২১-৩-১৩ বৃহস্পতিবার

● মিয়ানমারে বৌদ্ধদের হামলায় ৪টি মসজিদ, একটি মাদরাসাসহ হাজার হাজার মুসলিমদের ঘরবাড়ি ধ্বংস। নিহত কমপক্ষে ৭০ জন।

● গোপালগঞ্জে কোটালীপাড়ার একটি স্কুলের শ্রেণীকক্ষে 'আল্লাহ ও নামাজ' নিয়ে কটূক্তি করায় দেবব্রত রায় (৪০) নামে এক স্কুলশিক্ষককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় জনতা।

২২-৩-১৩ শুক্রবার

● তৃতীয় দিনের মতো মিয়ানমারে মুসলিমদের উপর হামলা। সেনা টহলের মাঝেই ছুড়ি ও লাঠি হাতে এলাকায় এলাকায় বৌদ্ধদের টহল। হাজার হাজার মুসলিম ঘর-বাড়ি ছাড়া।

● তিন মিনিটের টর্নেডোয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫০ টি গ্রাম লন্ডভন্ড। শিশুসহ ২৫ জনের মৃত্যু। আহত হাজারো মানুষ।

● হেফাজতে ইসলামের আহবানে বৃহত্তর চট্টগ্রামজুড়ে নফল সাওম পালনের কর্মসূচী।

● পাকিস্তানের পেশোয়ার ও খাইবার প্রদেশের উপজাতি এলাকায় ন্যাটো বাহিনীর কন্টেইনারে হামলায় ৭ জন নিহত ও ৪ জন আহত।

● নাস্তিকদের দালাল ফরিদ উদ্দিন মাসউদ ও তার সহযোগীদের সিলেটে অবাঞ্চিত ঘোষণা করলেন সিলেটের ওলামায়ে কিরাম।

২৩-৩-১৩ শনিবার

● নাস্তিকদের সমর্থণে মতিঝিল শাপলা চত্তর মোড়ে মাওলানা মাসউদের সমাবেশ। হাতে গোনা কয়েকশ লোকের সমাগম।

● পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের উপজাতি এলাকায় একটি চেকপোস্টে শক্তিশালী বোমা হামলায় কমপক্ষে ১৭ পাকিস্তানি সেনা নিহত।

● মালিতে যৌথবাহিনীর সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে আল কায়দার কমান্ডার আবদেল হামিদ আবু জাইদর শাহাদাত।

২৪-৩-১৩ রবিবার

● পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মিরানশাহ এলাকায় তল্লাশি চৌকিতে গতকাল রোববার ফিদায়ী হামলায় ২২ জন সেনা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৩৫ জন।

২৫-৩-১৩ সোমবার

● প্রধানমন্ত্রী বরাবর হেফাজতে ইসলামের স্মারকলিপি প্রদানের প্রোগ্রাম পুলিশি বাঁধার কারণে পন্ড। ঢাকা ও চট্টগ্রামে হাজার হাজার তাওহিদী জনতার জমায়েত।

● মিয়ানমারের ওহ দি কোন শহরে জরুরী অবস্থা চলা অবস্থায় হাজার হাজার বৌদ্ধদের হামলায় একটি মসজিদসহ প্রায় ১০০টি মুসলিমদের বাড়ি ঘরে আগুন। নিহতের সংখ্যা ৭০ এরও অধিক।

● উত্তর বঙ্গের ১০১ জন আলেম এক যৌথ বিবৃতির মাধমে নাস্তিকদের পক্ষাবলম্বনকারী ফরিদ উদ্দিন মাসউদকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করেন।

২৬-৩-১৩ মঙ্গলবার

● আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় শহর জালালাবাদে পুলিশ সদর দপ্তরে ফিদায়ী হামলায় পুলিশের পাঁচজন কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।

● মিয়ানমারে মুসলিম গণহত্যা অব্যাহত। কমপক্ষে ২০ জনের মৃত্যুর খবর গণমাধ্যমে প্রকাশ।

● পবিত্র কোরআন অবমাননা করার অভিযোগে বরিশালের চরবাড়িয়া এলাকা থেকে বজলু সরদার নামের এক ভণ্ড ফকিরকে তার কয়েকজন শিষ্যসহ গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী।

● ইসলামি মূল্যবোধের বিরুদ্ধাচরণ করছে সরকার : মাওলানা আহমাদুলাহ আশরাফ

২৭-৩-১৩ বুধবার

● মিয়ানমারে মুসলিমদের উপর বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের হামলায় ৮ জন নিহত। নিপিধো এবং ইয়াংগুন শহরে মসজিদ, দোকানপাট সহ বহু ঘরবাড়িতে আগুন।

● গুয়েন্তানামো বে কারাগারে বন্দিদের অবস্থা শোচনীয়। খাবার পানি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না।

২৮-৩-১৩ বৃহস্পতিবার

● মিয়ানমারে উগ্র সন্ত্রাসী বৌদ্ধদের হামলায় ৮ জন আলেম ও ২৮ জন মাদরাসার ছাত্র নিহত। এছাড়া রাস্তায় পিটিয়ে অনেক মুসলিমকে হত্যা করা হয়।

● শ্রীলঙ্কায় হাজার হাজার বৌদ্ধরা একত্রিত হয়ে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ঘরবাড়ি ও দোকান পাটে আগুন দেয়।

২৯-৩-১৩ শুক্রবার

● পুলিশের গুলিতে চাপাইনবাবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে ৭ জন নিহত। আহত শতাধিক।

● বাগদাদে সরকার সমর্থক শিয়াদের উপর গাড়ি বোমা হামলায় অন্তত ২৪ জন নিহত।

● পাকিস্তানের পেশোয়ার শহরে মার্কিন কনস্যুলেটের কাছে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে এক ফিদায়ী বোমা হামলায় ১০ জন নিহত।

৩০-৩-১৩ শনিবার

● নিখোজের ১৮ দিন পর ডা. ফরিদকে গ্রেফতার দেখায় ডিবি পুলিশ। জঙ্গিদের সংগঠিত করার গতানুগাতিক মিথ্যা অভিযোগ।

● মিয়ানমারের সিত কুইন শহরের দুই হাজার মুসলিমদের ঘরবাড়িতে হামলা। নিহত প্রায় ২২ জন।

৩১-৩-১৩ রবিবার

● রাজধানিসহ সারা দেশের জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহনের মাধ্যমে নাস্তিকদের বিরূদ্ধে হেফাজতে ইসলামের ৬ই এপ্রিলের লংমার্চ সফল করার প্রস্তুতি।

আহলে কুফফারদের তথ্য চুরি প্রতিরোধের উপায়

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহামাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহু।
আশা করি অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু দাতা আল্লাহর অশেষ কৃপায় আপনারা (মুজাহিদীন ভাইয়েরা) ভালো আছেন। আল্লাহ্ আপনাদের ভালো রাখুন। আমীন। চলুন এবার মূল আলোচনার দিকে যাই।

NetBIOS মূলত এক রকমের Transport Protocol যা মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এ ইনপুট ও আউটপুট পদ্ধতিতে তথ্য আদান প্রদান করে থাকে। এটি IBM এবং Sytek এর ডেভেলপ করা API (Application Programming Interface) যা LAN বা সার্ভার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে তথ্য আদান প্রদান করে থাকে। NetBIOS –TCP 139, 445 নং পোর্ট ব্যবহার করে থাকে। এসকল উন্মুক্ত পোর্ট ব্যবহার করে NetBIOS একটি কম্পিউটারের বিভিন্ন তথ্য চুরি করতে পারে।

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এর ৯৫/২০০০/এক্সপি এবং ভিস্তা সংস্করণে TCP 139, 445 নং পোর্ট ডিফল্ট ভাবেই উন্মুক্ত থাকে ফলে একজন কুফফার হ্যাকার খুব সহজেই টার্গেট কম্পিউটার এবং সার্ভার হতে তথ্য চুরি করতে পারে। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এর ৯৫/২০০০/এক্সপি এবং ভিস্তা সংস্করণ "File And Printer Sharing" অপশনের মাধ্যমে TCP 139, 445 নং পোর্ট ব্যবহার করে থাকে। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এর ৯৫/২০০০/এক্সপি এবং ভিস্তা সংস্করণে TCP 139, 445 নং পোর্ট ডিফল্ট ভাবেই উন্মুক্ত থাকলেও উইন্ডোজ ৭ এটি ডিফল্ট ভাবে ডিসএবল থাকে। তবে কোন কারণে উইন্ডোজ ৭ এ ব্যবহারকারী "File And Printer Sharing" অপশনের মাধ্যমে TCP 139, 445 নং পোর্ট চালু করলে ক্ষতির শিকার হতে পারে। অনেক সময় কিছু ভাইরাস বা হ্যাকারদের প্রোগ্রামের মাধ্যমে পোর্ট স্বয়ংক্রিয় ভাবে চালু হয়ে যেতে পারে। NetBIOS আক্রমণ করতে অবশ্যই ভিক্টিমের আইপি জানতে হবে।
NetBIOS আক্রমণের জন্য বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি আছে। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের CMD (Command Prompt) এর মাধ্যমেও NetBIOS আক্রমণ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন আইপি স্ক্যানিং টুল, আইপি এনালাইজার টুল এবং নেটওয়ার্ক ফিল্টার টুলের মাধ্যমেও NetBIOS আক্রমণ করা যেতে পারে। বর্তমানে রিমোট কন্ট্রোল টুলের মাধ্যমেও NetBIOS আক্রমণ করা হয়ে থাকে। তাই আমার প্রাণপ্রিয় মুজাহিদীন ভাই সকল সাবধান!
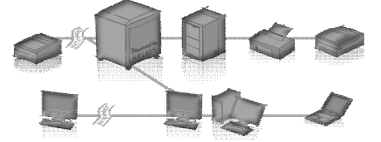
NetBIOS আক্রমণ প্রতিরোধ :

NetBIOS আক্রমণ প্রতিরোধ করতে প্রথমে আপনাকে TCP 139, 445 নং পোর্ট বন্ধ করতে হবে। এজন্য আপনাকে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের 'File And Printer Sharing' অপশনটি বন্ধ করতে হবে। 'File And Printer Sharing' option-টি বন্ধ করার জন্যঃ

১. Click করুন Start -> তারপর Connect To -> তারপর Show All Connections অথবা Start -> Control Panel -> Network Connections-এ click করুন,
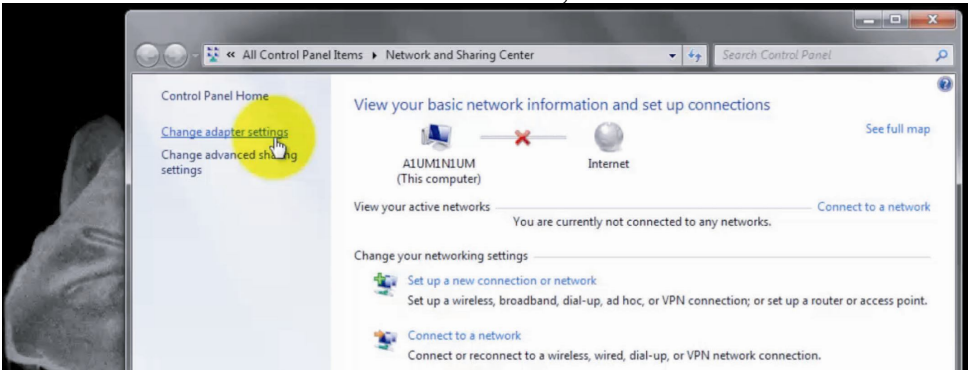
২. তারপর একটি উইন্ডো খুলবে এখানে আপনি যে network use করছেন তাতে right click করুন।
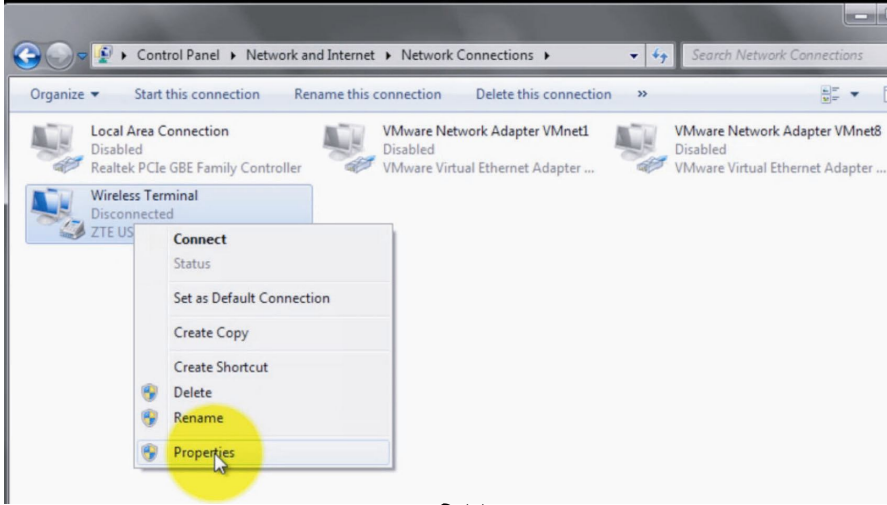
৩. এবং Properties-এ click করুন। তারপর আরও একটি উইন্ডো খুলবে।

৪. তাতে Networking tab-এ click করুন এবং "File And Printer Sharing for Microsoft Network"-এর টিক চিহ্নটি তুলে দিন।
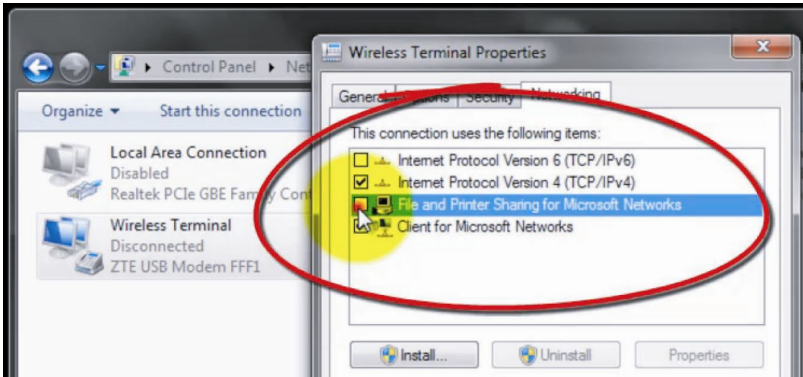
এবার Ok buttom-এ Click করুন। আলহামদুলিল্লাহ্, ইনশাআল্লাহ আমাদের কম্পিউটার নিরাপদ।
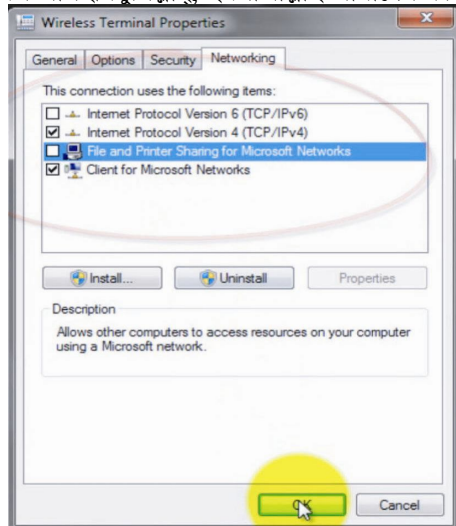
তবে সর্বদাই আল্লাহর (সুব.) উপরেই ভরসা রাখুন। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করি। ওয়াস সালাম।

সূত্র : ইন্টারনেট

Home About

attibyean jan 2013

Posted on January 20, 2013

মাসিক আত তিবইয়ান

ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: attibyean.tk

মাসিক আত তিবইয়ান-এ

আপনার লিখা পাঠান: attibyean@gmail.com

প্রাপ্তি স্থান:

১. হাসান কম্পিউটার
টাউন হল, বরগুনা
মোবাইল:
০১৯১৫৯৮৯৬৬০

২. মুহাম্মদ ফিরোজ
চৌরাস্তা, গাজীপুর
মোবাইল:
০১৯৩৪৯০৭১৪২

৩. মদিনা ইসলামিক লাইব্রেরী
মোল্লা মার্কেট, পানিসাইল, জিরানী বাজার, ঢাকা।
০১৭১৬৭৫৭২১৮

৪. মাকতাবাতুল মাজহার
১৫৪/বি, রোড # ১৯ (পুরাতন), প:ধানমন্ডি, মধুবাজার, (বড় মসজিদের উত্তর পাশে), ঢাকা।
০১৭২০৯০০২২৮